হীরামাণিক জ্বলে

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডি, এম. লাইব্রেরী
৪২নং, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক
গোপালদাস মজুমদার
, এম্, লাইব্রেরী
কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আষাঢ় ১৩৫৩
মূল্য দুই টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য
শৈলেন প্রেস
৪নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ছোট্ট গ্রাম সুন্দরপুর।

একটি নদীও আছে গ্রামের উত্তর প্রান্তে। মহকুমা থেকে বারো তেরো মাইল, রেল ষ্টেশন থেকেও সাত আট মাইল।

গ্রামের মুস্তফি বংশ এক সময়ে সমৃদ্ধিশালী জমিদার ছিলেন, এখন তাঁদের অবস্থা আগের মত না থাকলেও আশপাশের অনেকগুলি গ্রামের মধ্যে তাঁরাই এখনও পর্য্যন্ত বড়লোক বলেই গণ্য, যদিও ভাঙা পূজোর দালানে আগের মত জাঁকজমকে এখন আর পূজো হয় না—প্রকাণ্ড বাড়ীর যে মহলগুলোর ছাদ খসে পড়েছে গত বিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে, সেগুলো মেরামত করবার পয়সা জোটে না, বাড়ীর মেয়েদের বিবাহ দিতে হয় কেরাণী পাত্রদের সঙ্গে—অর্থের এতই অভাব।

সুশীল এই বংশের ছেলে। ম্যাট্রিক পাশ করে বাড়ী বসে আছে—বড় বংশের ছেলে, তার পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কখনো চাকুরী করেন নি, সুতরাং বাড়ী বসেই বাপের অন্ন ধ্বংস করুক, এই ছিল বাড়ীর সকলেরই প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়।

সুশীলও তাই করে আসচে অবিশ্যি।

সুন্দরপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস খুব বেশী নেই—

আগে অনেকঘর ভদ্র গৃহস্থের বাস ছিল, তাদের সবাই এখন বিদেশে চাকুরী করে—বড় বড় বাড়ী জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে।

মুস্তফিদের প্রকাণ্ড ভদ্রাসনের দক্ষিণে ও পূর্ব্বে তাঁদের দৌহিত্র রায় বংশ বাস করে। পূর্ব্বে যখন মুস্তফিদের সমৃদ্ধির অবস্থা ছিল তখন বিদেশ থেকে কুলগৌরব সম্পন্ন রায়দের আনিয়ে কন্যাদান করে জমিজমা দিয়ে এখানেই বাস করিয়েছিলেন এঁরা।

কালের বিপর্য্যয়ে সেই রায় বংশের ছেলেরা এখন সুশিক্ষিত ও প্রায় সকলেই বিদেশে ভাল চাকুরী করে। নগদ টাকার মুখ দেখতে পায়—বাড়ী কেউ বড় একটা আসে না—যখন আসে তখন খুব বড় মানুষী চাল দেখিয়ে যায়। পদে পদে মাতুল বংশের ওপর টেক্কা দিয়ে চলাই যেন তাদের দু-একমাস স্থায়ী পল্লীবাসের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য।

আশ্বিন মাস। পূজোর বেশি দিন দেরি নেই।

অঘোর রায়এর বড় ছেলে অবনী সস্ত্রীক বাড়ী এসেচে। শোনা যাচ্চে, দুর্গোৎসব না করলেও অবনী এবার ধূমধামে নাকি কালী পূজো করবে। অবনী সরকারী দপ্তরে ভাল চাকুরী করে। অবনীর বাবা অঘোর রায় ছেলের কাছেই বিদেশে থাকেন। তিনি এ-সময় বাড়ী আসেন নি, তাঁর মেজ ছেলে অখিলের সঙ্গে পুরী গিয়েছেন। অখিল যেন কোথাকার সবডেপুটি—পনেরো দিনের ছুটী নিয়ে স্ত্রীপুত্র ও বৃদ্ধপিতাকে নিয়ে বেড়াতে বার হয়েচে।

সুশীল অবনীদের বৈঠকখানায় বসে এদের চালবাজির কথা শুনছিল অনেকক্ষণ থেকে।

অবনী বল্লে—মামা, তোমাদের বড় সতরঞ্চি আছে ?

—একখানা দালানজোড়া সতরঞ্চি তো ছিল জানি—কিন্তু সেটা ছিঁড়ে গিয়েচে জায়গায় জায়গায়।

—ছেঁড়া সতরঞ্চি আমার চলবে না। তা হোলে কলকাতায় লোক পাঠিয়ে ভাল একখানি বড় সতরঞ্চি কিনিয়ে আনি। বন্ধুবান্ধব পাঁচজনে আসবে, তাদের সামনে বারকরার উপযুক্ত হওয়া চাই তো,—বড় আলো আছে ?

—বাতির ঝাড় ছিল, এক এক থাকে কাঁচ খুলে গিয়েচে—তাতে চলে তো নিও।

—তোমাদের তাতেই কাজ চলে ?

—কেন চলবে না ? দেখায় খুব ভাল। তা ছাড়া দুর্গোৎসবের কাজ দিনমানেই বেশি—রাত্রে আরতি হয়ে গেলেই আলোর কাজ তো মিটে গেল।

—আমার ডে-লাইটের ব্যবস্থা করতে হবে দেখচি। কালীপূজোর রাতে আলোর ব্যবস্থা একটু ভাল রকম থাকা দরকার। ইলেকট্রিক আলোয় বারো মাস বাস করা অভ্যেস, সত্যি পাড়াগাঁয়ে এসে এমন অসুবিধা হয়!

বৃদ্ধ সত্যনারায়ণ গাঙ্গুলী তাঁর ছোটছেলের একটা চাকুরীর জন্যে অবনীর কাছে ক'দিন ধরে হাঁটাহাঁটি করে একটু—অবিশ্যি খুব সামান্যই একটু ভরসা পেয়েছিলেন—তিনি অমনি

বলে উঠলেন—তা অসুবিধে হবে না? বলি তোমরা বাবাজি কি রকম জায়গায় থাকো, কি ধরণে থাকো—তা আমার জানা আছে তো। গঙ্গাচানের যোগে কলকাতা গেলেই তোমাদের ওখানে গিয়ে উঠি আর সে কি যত্ন! ওঃ ইলেক্‌টিরি আলো না হোলে কি বাবাজি তোমাদের চলে?

সুশীল কলকাতায় দু-একবার মাত্র গিয়েচে—আধুনিক সভ্যতার যুগের অনেক নতুন জিনিসই তার অপরিচিত—শিক্ষিত ও সহুরে বাবু অবনীর সঙ্গে ভয়ে ভয়ে তাকে কথা বলতে হয়।

তবুও সে বল্লে—ডে-লাইটের চেয়ে কিন্তু ঝাড়-লণ্ঠন দেখায় ভাল—

অবনী হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি।

—ওহে, যে যুগে জমিদারপুত্রেরা নিষ্কর্ম্মা বসে থাকতো আর হাতীতে চড়ে জরদ্গবের মত ঘুরে বেড়াতো—ও সব চাল ছিল সেকালের। মডার্ণ যুগে ও সব অচল; বুঝলে মামা? এ হোল প্রগতির যুগ—হাতীর বদলে এসেছে মোটর গাড়ী, ঝাড় লণ্ঠন আর শেজের বদলে ইলেক্‌ট্রিক লাইট—সেকালকে আঁকড়ে বসে থাকলে চলবে?

বনেদী পুরোণো আমলের চালচলনে আবাল্য অভ্যস্ত সুশীল বয়সে যুবক হোলেও প্রাচীনের ভক্ত।

সে বল্লে—কেন হাতী চড়াটা কি খারাপ দেখলে?

—রামোঃ জবড়জং ব্যাপার! হাতীর মত মোটা জানোয়ারের ওপর বসে থাকা পেট মোটা নাদুস্ নুদুস্—

সত্যনারায়ণ গাঙ্গুলী বল্লেন—গোবরগণেশ—

—জমিদারের ছেলেরই শোভা পায়, কিন্তু কাজে যারা ব্যস্ত সময় যাদের হাতে কম, দিনে যাদের ত্রিশ মাইল চক্কর দিয়ে বেড়াতে হয় নিজের কাজে বা আপিসের কাজে—তাদের পক্ষে দরকার মোটর-বাইক বা মোটর-কার। স্মার্ট যারা—তাদের উপযুক্ত যানই হচ্চে—

সুশীল প্রতিবাদ করে বল্লে—স্মার্ট কারা জানি নে, মোগল বাদশাদের সময় আকবর আওরঙ্গজেবের মত বীর হাতীতে চড়ে যুদ্ধ করতেন—তারা স্মার্ট হোল না—হোল তোমাদের কলকাতার আদ্দির পাঞ্জাবী-পরা চশমা চোখে ছোকরা বাবুর দল, যারা বাপের পয়সায় গড়ের মাঠে মোটরে হাওয়া খায়—কিংবা সখে পড়ে দু দশ কদম মোটর ড্রাইভ করে, তারা? অত বড় সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য, তারা হাতীতে চড়ে যুদ্ধ করতো, পুরুরাজ হাতীর পিঠে চড়ে আলেকজাণ্ডারের গ্রীক বাহিনীর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে ছিল—তারা স্মার্ট ছিল না, স্মার্ট হোল সিনেমায় ছোকরা এ্যাক্টারের দল?

সুশীল সেখান থেকে উঠে চলে এল। অবনীর ধরণধারণ তার ভাল লাগেনি—দূরসম্পর্কের মামাভাগ্নে, কোন কালের দৌহিত্র বংশের লোক, এই পর্য্যন্ত। এখন তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কি যোগ আছে?—কিছুই না। জমিদারের ছেলেদের ওপর অবনীর এ কটাক্ষ, সুশীলের মনে হোল তাকে লক্ষ্য করেই করা হয়েছে।

তা করতে পারে—এরা এখন সব হঠাৎ বড়লোকের দল, পুরোণো বংশের ওপর এদের রাগ থাকা অসম্ভব নয়।

সুশীল জমিদারপুত্রও বটে, নিষ্কর্ম্মাও বটে।, বসে খেতে খেতে দিনকতক পরে পেট মোটা হয়েও উঠবে—এ বিষয়েও নিঃসন্দেহ। অবনী তাকে লক্ষ্য করেই বলেচে নিশ্চয়ই।

বাড়ী এসে সুশীল জ্যাঠামশায়কে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা জ্যাঠামণি, আমাদের বংশে কখনো কেউ চাকরী করেচে?

জ্যাঠামশায় তারাকান্ত মুস্তফির বয়েস সত্তরের কাছাকাছি। তিনি পূজোর দালানের সঙ্গে ছোট কুঠরীতে বসে সারাদিন বৈষয়িক কাগজপত্র দেখেন এবং মাঝে মাঝে গীতা পাঠ করেন। ঘরটার কুলুঙ্গিতে ও দেওয়ালের গায়ে তাকে গত পঞ্চাশ বছরের পুরোণো পাঁজি সাজানো। তারাকান্ত বল্লেন—কেন বাবা সুশীল? এ বংশে কারো কোনো ভাবনা ছিল যে চাকুরী করবে?

—ছেলেরা কি করতো জ্যাঠামণি?

—পায়ের ওপরে পা দিয়ে বসে খেয়ে আমাদের পুরুষানুক্রমে চলে আসচে—তবে আজকাল বড় খারাপ সময় পড়েচে, জমিজমাও অনেক বেরিয়ে গেল—তাই যা-হয় একটু কষ্ট যাচ্ছে! কি আবার করবে কে? ওতে আমাদের মান যায়।

সুশীল কথাটা ভেবে দেখলে অবসর সময়ে। অবনীর কথাগুলো হিংসেতে ভরা ছিল এখন দেখা যাচ্ছে। অবনীদের বাইরে বেরিয়ে চাকুরী না করলে চলে না—আর তাদের চিরকাল

চলে আসচে বাড়ী বসে—এতে অবনীর হিংসের কথা বৈকি।

মামার বাড়ী খেয়ে চিরকাল ওরা মানুষ। আজ হঠাৎ বড়লোক হয়ে চাল দেওয়া, কথাবার্ত্তায় সেই মাতুল বংশকেই ছোট করতে চায়।

সুশীল এর প্রমাণ অন্য একদিক থেকে খুব শিগগিরই পেলে। মুস্তফিদের সাবেকী পূজোর মণ্ডপে দুর্গোৎসব টিম্ টিম্ করে সমাধা হোল—লোকের পাতে ছেঁচড়া, কলাইয়ের ডাল, ক্ষেতের রাঙা নাগরা চালের ভাত, পুকুরের মাছ, জোলো দুধোলো দই ও চিনির ডেলা ঘোঙা মোণ্ডা খাইয়ে—কিন্তু অবনীদের বাড়ী যে কালীপূজো হোলো—সে একটা দেখবার জিনিস!

কালীপূজোর রাত্রে গাঁশুদ্ধ পোলাও মাংস, কলকাতা থেকে আনা দই রাবড়ী, সন্দেশ খেলে। টিন টিন দামী সিগারেট নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বিলি হোল, পরদিন দুপুরে যাত্রা ও ভাসানের রাত্রে প্রীতি সম্মেলনে প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। অবনীর এক বন্ধু আবার ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইড্ দেখিয়ে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এক বক্তৃতাও করলে। গ্রামের লোক সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলো। এ গাঁয়ে এমনটী কখনো আর হয় নি—কেউ দেখেনি। সকলের মুখে অবনীর সুখ্যাতি।

কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি ছিল না, যদি তারা সেই সঙ্গে অমনি মুস্তফি জমিদারদের ছোট করে না দিত।

—নাঃ মুস্তফিরা কখনো এদের সঙ্গে দাঁড়ায় ? বলে কিসে আর কিসে ?

—যা বলেচো ভায়া। নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবে না—

—শুধ্ লম্বা লম্বা কথা আছে—আর কিছু নেই রে ভাই !

এধরণের একটা কথা একদিন সুশীলের নিজের কানেই গেল। নিজেদের পুকুরের ঘাটে বসে সুশীল ছিপে মাছ ধরচে, গাঁয়ের ওর পরিচিত দুটি ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে পথ দিয়ে যাচ্ছেন। একজন বল্লেন—মুস্তফিদের ওপর এবার খুব এক হাত নিয়েচে অবনী। অপর জন বল্লে—তার মানে মুস্তফিদের আর কিছু নেই। সব ছেলেগুলো বাড়ী বসে বসে খাবে, আজকালকার দিনে কি আর সেকেলে বনেদি চাল চলে ? লেখাপড়াতো একটা ছেলে ভাল করে শিখলে না—

লেখাপড়া শিখেও তো ঐ সুশীলটা বাপের হোটেলে দিব্যি বসে খাচ্ছে—ওদের কখনো কিছু হবে না বলে দিলাম। যত সব আল্‌সে আর কুঁড়ে। কথাটা সুশীলের মনে বড় লাগলো—এদিক থেকে সে কোনোদিন নিজেকে বিচার করে দেখেনি। চিরকাল তো এই রকম হয়ে আসচে তাদের বংশে, এতদিন কেউ কিছু বলে নি, আজকাল বলে কেন তবে ?

পাশের গ্রামে সুশীলের এক বন্ধু থাকতো, সুশীল তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে। ছেলেটীর নাম প্রমথ, তার বাবা এক সময়ে মুস্তফিদের ষ্টেটের নায়েব ছিলেন, কিন্তু তারপর চাকুরী ছেড়ে মালচালানী ব্যবসা করে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেচেন।

প্রমথ বেশ বুদ্ধিমান ও বলিষ্ঠ যুবক। সে নিজের চেষ্টায় গ্রামে একটা নৈশ স্কুল করেচে, একটা দরিদ্র ভাণ্ডার খুলেচে—তার পেছনে গ্রামের তরুনদের যে দলটি গড়ে উঠেছে—গ্রামের মঙ্গলের জন্যে তারা না করতে পারে এমন কাজ নেই। সম্প্রতি প্রমথ বাবার আড়তে বেরুতে আরম্ভ করেচে।

সুশীল বল্লে—প্রমথ, আমাকে তোমাদের আড়তে কাজ শেখাবে ?

প্রমথ আশ্চর্য্য হয়ে ওর দিকে চেয়ে বল্লে—কেন বল তো ? হঠাৎ এ কথা কেন তোমার মুখে ?

—বসে বসে চিরকাল বাপের ভাত খাবো ?

—তোমাদের বংশে কেউ কখনো অন্য কাজ করেনি তাই বলচি। হঠাৎ এ মতিবুদ্ধি ঘটলো কেন তোমার ?

—সে বলবো পরে। আপাততঃ একটা হিল্লে করে দেও তো।

ওর মধ্যে কঠিন আর কি। যেদিন ইচ্ছে এসো বাবার কাছে নিয়ে যাবো।

মাস খানেক ধরে সুশীল ওদের আড়তে বেরুতে লাগলো, কিন্তু ক্রমশঃ সে দেখলে ভূষি মাল চালানীর কাজের সঙ্গে তার অন্তরের যোগাযোগ নেই। তার বাবা ছেলেকে আড়তে যোগ দিতে বাধা দেন নি, বরং বলেছিলেন ব্যবসা কাজে যদি কিছু টাকা দরকার হয়, তাও তিনি দেবেন।

একদিন তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আড়তের কাজ কি রকম মনে হচ্ছে ?

সুশীল বল্লে—ও ভাল লাগে না, তার চেয়ে বরং ডাক্তারি পড়ি।

—তোমার ইচ্ছে। তা হোলে কলকাতায় গিয়ে দেখে শুনে এসো। কলকাতায় এসে সুশীল দেখলে ডাক্তারী স্কুলে ভর্ত্তি হবার সময় এখন নয়। ওদের বছর আরম্ভ হয় জুলাই মাসে—তার এখনও তিন চার মাস দেরী, সুশীলের এক মামা খিদিরপুরে বাসা করে থাকতেন, তাঁর বাসাতেই সুশীল এসে উঠেছিল—তাঁরই পরামর্শে সে দু একটা আপিসে কাজের চেষ্টা করতে লাগলো।

দিন পনেরো অনেক আপিসে ঘোরাফেরা করেও সে কোথাও কোনো কাজের সুবিধে করতে পারলে না—এদিকে হাতের টাকা এল ফুরিয়ে। মামার বাসায় খাবার খরচ লাগতো না অবিশ্যি, কিন্তু হাত-খরচের জন্য রোজ একটি টাকা দরকার। বাবার কাছে সে চাইবে না—নগদ টাকার সেখানে বড় টানাটানি, সে জানে। একটা কিছু না করে এবার বাড়ী ফিরবার ইচ্ছে নেই তার। অথচ করাই বা যায় কি ? সন্ধ্যার দিকে গড়ের মাঠে বসে রোজ ভাবে।

সুশীল সেদিন গড়ের মাঠের একটা নির্জ্জন জায়গায় বসে ছিল চুপ করে। বড্ড গরম পড়ে গিয়েচে—খিদিরপুরে তার মামার বাসাটীও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চীৎকার ও উপদ্রবে

সদা সরগরম—সেখানে গিয়ে একটা ঘরে তিন চারটী আট দশ বছরের মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটাতে হবে। সুশীলের ভাল লাগে না আদৌ। তাদের অবস্থা এখন খারাপ হতে পারে, কিন্তু দেশের বাড়ীতে জায়গার কোন অভাব নেই।

ওপরে নীচে বড় বড় ঘর পড়ে আছে—লম্বা লম্বা দালান, বারান্দা—পুকুরের ধারের দিকে বাইরের মহলে এত বড় একটা রোয়াক আছে যে, সেখানে অনায়াসে একটা যাত্রার আসর হোতে পারে।

এমন সব জ্যোৎস্নারাতে কতদিন সে পুকুরের ধারে ওই রোয়াকটায় একা বসে কাটিয়েচে। পুকুরের ওপারে নারিকেল গাছের সারি, তার পেছনে রাধাগোবিন্দের মন্দিরের চূড়োটা, সামনের দিকে ওর ঠাকুরদাদার আমলের পুরোনো বৈঠকখানা। এ বৈঠকখানায় এখন আর কেউ বসে না—কাঠ ও বিচুলি, শুকনো তেঁতুল, ভূষি, ঘুঁটে, ইত্যাদি রাখা হয় বর্ষাকালে।

মাঝে মাঝে সাপ বেরোয় এখানে।

সেবার ভাদ্র মাসে তাল-নবমীর ব্রতের ব্রাহ্মণ ভোজন হচ্ছে পূজোর দালানে, হঠাৎ একটা চেঁচামেচি শোনা গেল পুকুর পাড়ের পুরোণো বৈঠকখানার দিক থেকে।

সবাই ছুটে গিয়ে দেখে হরি চাকর বৈঠকখানার মধ্যে ঢুকেছিল বিচালি পাড়বার জন্যে—সেই সময় কি সাপে তাকে কামড়েচে।

হৈ হৈ হোল। লোকজন এসে সারা বৈঠকখানার মালামাল বার করে সাপের খোঁজ করতে লাগলো। কিচ্ছু গেল না দেখা। হরি চাকর বল্লে, সে সাপ দেখেনি, বিচুলির মধ্যে থেকে তাকে কামড়েচে।

ওঝার জন্যে রাণীনগরে খবর গেল। রাণীনগরের সাপের ওঝা তিনটে জেলার মধ্যে বিখ্যাত—তারা এসে ঝাড়ফুঁক করে হরিকে সে যাত্রা বাঁচালে। লোকজনে খুঁজে সাপও বের করলে—প্রকাণ্ড খয়ে গোখ্রো! হরি যে বেঁচে গেল তার পুনর্জ্জন্ম বলতে হবে।

—বাবু, ম্যাচিস্ আছে—ম্যাচিস্?

সুশীল চমকে মাথা তুলে দেখলে, একটী কালোমত লোক, অন্ধকারে ভাল দেখা গেল না। নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত অবাঙালী লোক বলেই সুশীলের ধারণা হোল—কারণ তারাই সাধারণতঃ দেশলাইকে 'ম্যাচিস্' বলে থাকে।

সুশীল ধূমপান করে না, সুতরাং সে দেশলাইও রাখে না। সে কথা লোকটাকে বলতে সে চলেই যাচ্ছিল—কিন্তু খানিকটা গিয়ে আবার অন্ধকারের মধ্যে যেন কি ভেবে ফিরে এল।

সুশীলের একটু ভয় হোল। লোকটীকে এবার সে ভাল করে দেখে নিয়েচে অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে। বেশ সবল, শক্ত হাত পা ওয়ালা চেহারা—গুণ্ডা হওয়া বিচিত্র নয়। সুশীলের পকেটে বিশেষ কিছু নেই—টাকা তিনেক মাত্র। সুশীল একটু

সতর্ক হয়ে সরে বসলো। লোকটা ওর কাছে বিনীত সুরে বল্লে—বাবুজি দু আনা পয়সা হবে?

সুশীল বিনা বাক্যব্যয়ে একটা দুয়ানি পকেট থেকে বের করে লোকটার হাতে দিলে। তাই নিয়ে যদি খুসি হয়, হোক্ না। এখন ও চলে গেলে যে হয়!

চলে যাওয়ার কোনো লক্ষণ কিন্তু লোকটার মধ্যে দেখা গেল না। সে সুশীলের কাছেই এসে সকৃতজ্ঞ সুরে বল্লে—বহুৎ মেহেরবাণী আপনার বাবু। আমার আজ খাওয়ার কিছু ছিল না—এই পয়সা লিয়ে হুটেলে গিয়ে রোটি খাবো। বাবুজির ঘর কুথায়?

ভাল বিপদ দেখা যাচ্ছে। পয়সা পেয়ে তবুও নড়ে না যে! নিশ্চয় আরও কিছু খারাপ মতলব আছে ওর মনে মনে। সুশীল চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখলে, কাছাকাছি কেউ নেই। পকেটে টাকা তিনটে ছাড়া সোনার বোতামও আছে জামায়, হঠাৎ এখন মনে পড়লো।

ও উত্তর দিলে—কলকাতাতেই বাড়ী, বালিগঞ্জে। আমার কাকা পুলিশে কাজ করেন কিনা, এদিকে বিকেলে রোজ বেড়াতে আসেন মোটর নিয়ে। এতক্ষণ এলেন বলে, রেড্ রোডে মোটর রেখে এখানেই আসবেন। আমি এখানে থাকি রোজ, উনি জানেন।

—বেশ বাবু, আপনাকে দেখেই বড় ঘরানা বলে মনে হয়।

সুশীলের মনে কৌতূহল হওয়াতে সে বল্লে—তুমি কোথায় থাকো ?

—মেটেবুরুজে বাবুজি।

—কিছু করো নাকি ?

—জাহাজে কাজ করতাম, এখন কাজ নেই। ঘুরি ফিরি কাজের খোঁজে। রোটির যোগাড় করতে হবে তো ?

লোকটার সম্বন্ধে সুশীলের কৌতূহল আরো বেড়ে উঠলো। তা ছাড়া লোকটার কথাবার্ত্তার ধরণে মনে হয় লোকটা খুব খারাপ ধরণের নয় হয় তো। সুশীল বল্লে—জাহাজে কতদিন খালাসিগিরি করেচ ?

—দশ বছরের কুছু ওপর হবে।

—কোন কোন জায়গায় গিয়েচ ?

—সব দেশে। যে দেশে বোলবেন সে দেশে। জাপান লাইন, বিলেতের লাইন, জাভা সুমাত্রার লাইন—এস্ এস্ পেন গুইন, এম্ এস্, গোলকুণ্ডা—এস্, এস্ নলডেরা—পিয়েনোর বড় জাহাজ নলডেরা, নাম শুনেছেন ?

'পিয়েনো' কি জিনিস, পল্লীগ্রামের ছেলে সুশীল তা বুঝতেই পারলে না। না, ও সব নাম সে শোনেনি।

—তা বাবুজি, আপনার কাছে ছিপাবো না। সরাব পিয়ে পিয়ে কাজটা খারাবি হয়ে পড়লো, জাহাজ থেকে ডিস্চার্জ্জ করে দিলো। এখন এই কোষ্টো যাচ্ছে, মুখ ফুটে কাউকে বলতে ভি পারি নে। কি করবো, নসীব-বাবুজি।

—জাহাজের কাজ আবার পাবে না ?

—পাবো বাবুজি, ডিসচার্জ্জ সার্টিক্ ফিটিক্ ভাল আছে। সরাব টরাবের কথা ওতে কুছু নেই। কাপ্তানটা ভাল লোক, তাকে কেঁদে গোড় পাকড়ে বল্লাম—সাহেব, আমার রোটি মেরো না। ও কথা লিখো না।

লোকটি আর একটু কাছে এসে ঘেঁসে বসলো। বল্লে —আমার নসীব খারাপ বাবু—নয় তো আমার আজ চাকুরী করে খেতে হবে কেন ? আজ তো আমি রাজা।

সুশীল মৃদু কৌতূহলের সুরে জিজ্ঞেস করলে—কি রকম ?

লোকটি এদিক ওদিক চেয়ে সুর নামিয়ে বল্লে—আজ আর বোলবো না। এইখানে কাল আপনি আসতে পারবেন ?

—কেন পারবো না ?

—তাই আসবেন কাল। আচ্ছা বাবু, আপনি পুরানো লিখা পড়তে পারেন ?

সুশীল একটু আশ্চর্য্য হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—কি লেখা ?

—সে কাল বাৎলাবো। আপনি কাল এখানে আসবেন, তবে বেলা থাকতে আসবেন। সূরয ডুববার আগে।

মামার বাসায় এসে কৌতূহলে সুশীলের রাতে চোখে ঘুমই এল না। এক একবার তার মনে হোল, জাহাজী মাল্লা কতদূর কতদেশ ঘুরেচে, কোনো এক আশ্চর্য্য ব্যাপারের কথা কি তাকে বলবে ? কোনো নতুন দেশের কথা ? পুরোনো লেখা কিসের ?…

ওর ছোট মামাতো ভাই সনৎ ওর পাশেই শোয়। গরমে তারও চোখে ঘুম নেই। খানিকটা উস্‌খুস্ করার পরে সে উঠে সুইচ্ টিপে আলো জ্বাললে। বল্লে—দাদা চা খাবে? চা করবো?

—এত রাত্তিরে চা কিরে?

—কি করি বলো। ঘুম আসচে না চোখে—খাও একটু চা।

সনৎ ছেলেটিকে সুশীল খুব পছন্দ করে। কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ারের ছাত্র, লেখাপড়াতেও ভাল, ফুটবল খেলায় এরই মধ্যে বেশ নাম করেচে, কলেজ টিমের বড় বড় ম্যাচে খেলবার সময় ওকে ভিন্ন চলে না।

সনতের আর একটা গুণ, ভয় বলে কোনো জিনিষ নেই তার শরীরে। মনে হয় দুনিয়ার কোনো কিছুকে সে গ্রাহ্য করে না। দুবার এই স্বভাবের দোষে তাকে বিপদে পড়তে হয়েছিল, একবার খেলার মাঠে এক সার্জ্জেণ্টের সঙ্গে মারামারি করে, নিজে তাতে মার খেয়েছিলও খুব—মার দিয়েছিলও। সেবার ওর বাবা টাকাকড়ি খরচ করে ওকে জেলের দরজা থেকে ফিরিয়ে আনেন। আর একবার মাহেশের রথ তলায় একটী মেয়েকে গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে প্রায় গুণ্ডার ছুরিতে প্রাণ দিয়েছিল আর কি। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক যুবকদল ওকে গুণ্ডাদের মাঝখান থেকে টেনে উদ্ধার করে আনে।

সুশীল বল্লে—সনৎ, কতদূর লেখাপড়া করবি ভাবচিস?

—দেখি দাদা। বি, এস, সি পর্য্যন্ত পড়ে একটা কারখানায় ঢুকে কাজ শিখবো। কলকব্জার দিকে আমার ঝোঁক, সে তো তুমি জানোই—

—আমি যদি কোনো ব্যবসায় নামি, আমার সঙ্গে থাকবি তুই ?

—নিশ্চয়ই থাকবো। তুমি যেখানে থাকবে, যা করবে—আমি তাতে থাকি এ আমার বড় ইচ্ছে কিন্তু। কি ব্যবসা করবে ভাবচো দাদা ?

—আচ্ছা, কাউকে এখন এ সব কিছু বলিস নে। তোকে আমি জানাবো ঠিক সময়ে। তোকে নইলে আমার চলবে না। চল আজ শুয়ে পড়ি—রাত দুটো বাজে—

পরদিন সুশীল গড়ের মাঠে নির্দ্দিষ্ট জায়গাটীতে গিয়ে একা বসে রইল। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল—তবুও লোকটির দেখা নেই।

অন্ধকার নামল। আসবেনা সে লোক ? হয়তো নয়। কি একটা বলবে ভেবেছিল কাল, রাতারাতি তার মন ঘুরে গেছে।

রাত আটটার সময় সুশীল উঠতে যাবে, এমন সময়ে পেছনে পায়ের শব্দ শুনে সে চেয়ে দেখলে।

পরক্ষণেই তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

লোকটা ঠিক তার পিছনেই দাঁড়িয়ে।

—সেলাম, বাবুজি! মাপ করবেন, বড় দেরী হয়ে গেল। এই দেখুন—

লোকটার পায়ের ওপর দিয়ে ভারী কি একটা জিনিষ চলে গিয়েচে যেন। সাদা কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—কিন্তু ব্যাণ্ডেজ রক্তে ভিজে উঠেছে।

সুশীল বল্লে—এঃ, কি হয়েচে পায়ে?

—এই জন্যেই দেরী হয়ে গেল বাবুজি। বাড়ী থেকে বেরিয়েচি, আর একটা ভারী হাতে ঠেলা-গাড়ী পায়ের ওপর এসে পড়লো। দুজন লোক ঠেলছিল, তাদের সঙ্গে মারামারি হয়ে গেল আমার সঙ্গের লোকদের।

—বসো বসো। তোমার পায়ে দেখচি সাংঘাতিক লেগেচে। না এলেই পারতে।

—না এলে আপনি তো হারিয়ে যেতেন। আপনাকে আর পেতাম কোথায়? রিক্সা করে এসেচি বাবুজি। দাঁড়াতে পারচি নে।

লোকটা ঘাসের ওপর বসে পড়লো। বল্লে—আজ অন্ধকার হয়ে গিয়েচে বাবুজি, আজ কোনো কাজ হবে না।

লোকটা কথা বলবে, সুশীল শুনবে। এতে দিনের আলোর কি দরকার, সুশীল বুঝতে পারলে না। বল্লে—কি কথা বলবে বলেছিলে—বলে যাওনা?

লোকটা ধীরে ধীরে চাপাগলায় অনেক কথা বল্লে—মোটামুটি তার বক্তব্য এই :—

তার বাড়ী আগে ছিল পশ্চিমে। কিন্তু অনেকদিন থেকে সে বাংলাদেশে আছে এবং বাঙালী খালাসীদের সঙ্গে কাজ করে বাংলা শিখেচে। লোকটা মুসলমান, ওর নাম জামাতুল্লা। একবার কয়েকজন তেলেগু লস্করের সঙ্গে সে একটা জাহাজে কাজ করে—ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজের বিভিন্ন দ্বীপে নারকোল ছোবড়া ও শুকনো নারকোল কুচি বোঝাই দিয়ে নিয়ে যেতো মাদ্রাজ থেকে। সেই সময় একবার তাদের জাহাজ ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে অচল হয়ে পড়ে। সৌরাবায়া থেকে তাদের কোম্পানীর অন্য জাহাজ এসে তাদের জাহাজের মাল তুলে নিয়ে যাবার আগে সাতদিন ওরা সেইখানে পড়েছিল। একদিন সমুদ্রের বিষাক্ত কাঁকড়া খেয়ে জাহাজশুদ্ধ লোকের কলেরা হোল।

এইখানে সুশীল জিজ্ঞেস করলে—সবারই কলেরা হোল?

—কেউ বাদ ছিল না বাবু। খাবার পাওয়া যেতো না, পাহাড়ের একটা গর্ত্তে কাঁকড়া পেয়ে সেদিন ওরা তাই ধরেছিল। ছোট, ছোট—লাল কাঁকড়া।

তারপর?

দু'জন বাদে বাকি সব সেই রাত্রে মারা গেল। বাবুজি, সে রাতের কথা ভাবলে এখনও ভয় হয়। সতেরো জন দিশি লস্কর আর দুজন ওলন্দাজ সাহেব—একজন মেট্ আর একজন ইঞ্জিনিয়ার—সেই রাত্রে সাবাড়। রইলাম বাকি কাপ্তান আর আমি।

তারপর জাহাজের কাপ্তেন ওকে বল্লে—মড়াগুলো টান দিয়ে ফেলে দাও জলে—

ও বল্লে—আমি মুর্দ্দফরাস নই সাহেব, ও আমি ছোঁব না—সাহেব ওকে গুলি করে মারতে এল। ও গিয়ে লুকুলো ডেকের ঢাকুনি খুলে হোল্ডের মধ্যে। সেই রাত্রে কাপ্তেন সাহেব খুব মদ খেয়ে চীৎকার করে গান গাইচে—ও সেই সময় জাহাজের বোট খুলে নিয়ে নামাতে গেল।

ডেভিট্ থেকে বোট নামাবার শব্দে সাহেবের মদের নেশা ভাঙলো না তাই নিস্তার—ডেকের ওপরে তখন ছুটো মড়া পড়ে রয়েচে—মরণের বীজ জাহাজের সর্ব্বত্র ছড়ানো, ভয়ে ও কিছু মুখে দেয় নি সকাল থেকে, পাছে কলেরা হয়। সুতরাং অনাহারে ও ভয়ে খানিকটা তুর্ব্বলও হয়ে পড়েচে।

দূরে ডাঙা দেখা যাচ্ছিল ছুপুরের দিকে ও লক্ষ্য করেছিল। সারা রাত নৌকো বাইবার পরে ভোরে এসে বোট ডাঙায় লাগলো। ও নেমে দেখে ডাঙায় ভীষণ জঙ্গল—ওদেশের সব দ্বীপেই এ ধরণের জঙ্গল ও জানতো। লোকজনের কোনো চিহ্ন নেই কোনো দিকে।

বোট ডাঙায় বেঁধে ও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছু দিন হাঁটলে, শুধু গাছের কচি পাতা আর এক ধরণের অম্লমধুর ফল খেয়ে। মানুষের বসতির সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় এসে হঠাৎ একেবারে ও অবাক হয়ে গেল।

ওর সামনে প্রকাণ্ড বড় সিংদরজা—কিন্তু বড় বড় লতাপাতা

উঠে একেবারে ঢেকে ফেলে দিয়েচে। সিংদরজার পর একটা বড় পাঁচিলের খানিকটা—আরও খানিক গিয়ে একটা বড় মন্দির, তার চূড়ো ভেঙে পড়েছে—মন্দিরের গায়ে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি বলে তার মনে হোল। সে ভারতের লোক, হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি সে চেনে। এ ক্ষেত্রে হয়তো সে ঠিক চিনতে পারে নি—তবে তার ওই রকম বলেই মনে হয়েছিল।

অবাক হয়ে সে আরও ঘুরে ঘুরে দেখলে। জায়গাটা একটা বহুকালের পুরোণো সহরের ভগ্নস্তূপ বলে মনে হোল। কত মন্দির, কত ঘর, কত পাথরের সিংদরজা, গভীর বনের মধ্যে বড় বড় কাছির মত লতার নাগপাশ বন্ধনে জড়িয়ে কত যুগ ধরে পড়ে আছে। ভীষণ বিষধর সাপের আড্ডা সর্ব্বত্র। একটা বড় ভাঙা মন্দিরে সে পাথরের প্রকাণ্ড বড় মূর্ত্তি দেখেছিল—প্রায় আট দশ হাত উঁচু।

সন্ধ্যা আসবার আর বেশি দেরী নেই দেখে তার বড় ভয় হয়ে গেল। এ সব প্রাচীন কালের নগর সহর—জিন পরীর আড্ডা—তেলেগু লস্করেরা যাকে ওদের ভাষায় বলে 'বিহ্মমুনি'।

বিহ্মমুনি বড় ভয়ানক জিন, হিন্দুদের পুরোহিত মারা যাওয়ার পর বিহ্মমুনি হয়। এই গহন অরণ্যের মধ্যে লোকহীন, পরিত্যক্ত বহু প্রাচীন নগরীর অলিতে গলিতে ঝোপে ঝাপে ধূম্রবর্ণ, বিকটাকার, কত যুগের বুভুক্ষু বিহ্মমুনির দল সন্ধ্যার অন্ধকার পড়বার সঙ্গে সঙ্গে শিকারের সন্ধানে জাগ্রত হয়ে উঠে হাঁক-পাড়ে—'ম্যয় ভূখা হুঁ!' তাদের হাতের নাগালে পড়লে

কি আর রক্ষে আছে? অতএব এখান থেকে পালানোই একমাত্র বাঁচবার পথ।

সুশীল একমনে শুনছিল—'পালিয়ে গেলে কোথায়?'

—সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আবার তুদিন তিনদিন ধরে হেঁটে সমুদ্রের ধারে পৌঁছুলাম। জাহাজে উঠবো এসে এই তখন খেয়াল।

—আবার সেই মড়া ভর্ত্তি জাহাজে কেন?

—বুঝলেন না বাবুজি? যদি জাহাজে উঠি, তবে তো দেশে পৌঁছুবার ঠিকানা মেলে। নয়তো সেই জংলী মুলুকে যাবো কোথায়? চারিধারে সমুদ্র, যদি জাহাজ না পাই তবে সেই জংলী মুলুকে না খেয়ে মরতে হবে—নয়তো জংলী লোকেরা খুন করে ফেলবে। বাবুজি, তখন এমন ডর, যে রাতে ঘুমুতে পারি নে। একদিন প্রকাণ্ড এক বনমানুষের হাতে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম—নসীবের জোর ছিল খুব। অমন ধরণের জানোয়ার যে তুনিয়ায় আছে তা জানতাম না। গাছের ওপর একদল বনমানুষ ছিল—ধাড়িটা আমায় দেখতে পেলে না বাবুজি, দেখলে আর বাঁচতাম না।

সুশীল মনে মনে একবার চিন্তা করে দেখলে। লোকটা মিথ্যা কথা বলচে না সত্যি বলচে, ওর এই বনমানুষের কথা তার একটা মস্ত বড় পরীক্ষা। সুশীল জন্তুজানোয়ার সম্বন্ধে কিছু কিছু পড়াশুনো করেছিল, বাড়ীতে আগে নানা রকম পাখী, বেজি, খরগোস, সজারু ও বাঁদর পুষতো। গাঁয়ের লোকে ঠাট্টা

করে বলতো 'মুস্তফিদের চিড়িয়াখানা'। এ সম্বন্ধেও ইংরিজি বইও নিজের পয়সায় কিনেছিল।

ও বল্লে—কত বড় বনমানুষ ?

—খুব বড় বাবুজি। ইন্দোরের পালোয়ান রামনকীব সিংএর চেয়েও একটা বাচ্চার গায়ে জোর বেশি। নিজের আঁখসে দেখলাম।

—কি করে দেখলে ?

—ডাল ফাঁড়লে হাত আর পা দিয়ে ধরে। আমার মাথার ওপর গাছপালার ডালগুলো তো বনমানুষে বিলকুল ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছিল।

—তবে তো তুমি সুমাত্রা দ্বীপে কিংবা বোর্ণিওতে গিয়েছিলে। কিংবা ওর কাছাকাছি কোনো ছোট দ্বীপে। তুমি যে বনমানুষ বলচো—ও হচ্চে ওরাং ওটাং—ও ছাড়া আর কোনো বনমানুষ ওদেশে থাকবে না—

লোকটা হঠাৎ অত্যন্ত বিস্ময়ে সুশীলের মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলো—দাঁড়ান-দাঁড়ান, বাবুজি, কি জায়গার নাম করলেন আপনি ?

—সুমাত্রা আর বোর্ণিও—

—ওঃ, বাবুজি আপনি বহুৎ পড়ালিয়া আদমি ! এই নাম কতকাল শুনিনি জানেন ? আজ দশ বারো বছর। শেষের নামটা—কি বল্লেন বাবুজি ? বোর্ণিও ? ঠিক। সুলু সি'র নাম জাহাজী চার্টে দেখবেন। সুলু সি'র কাছাকাছি এপার

ওপার। কেন জানেন বাবুজি? এই নাম শুনলে আমার বহুৎ কথা মনে পড়ে যায়। তাজ্জব কথা। আজ দেখচেন আমায় এই গড়ের মাঠে বসে তু একটা পয়সা ভিক্ষে করচি— কিন্তু আমি আজ—আচ্ছা, সে কথা এখন থাক্।

—তারপর কি করলে বলো না? জঙ্গল থেকে এসে উঠলে আবার জাহাজে?

—হাঁ উঠলাম। সেই কাপ্তান তখন মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে নিজের কেবিনে ঢুকে চাবি দিয়ে ঘুমুচ্চে—আমি আগে তো ভাবলাম মরে গিয়েচে। মড়াগুলো কতক কাপ্তান ফেলে দিয়েচে —কতক এখনও রয়েচে।

ভীষণ বদ গন্ধ—আর সেই গরম। আমি জাহাজের কিছু খেতে পারিনে কলেরার ভয়ে। ডাঙায় গিয়ে মাছ ধরতাম— আর কচ্ছপ।

—কাপ্তেন বেঁচে ছিল?

—বেঁচে ছিল কিন্তু বেচারীর মগজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল একেবারে। তখনকার দিনে বেতার ছিল না, আমাদের জাহাজে যে অমন হয়ে গেল, সে খবর কোথাও দেওয়া যায় নি। ওসব দিকের সমুদ্রে জাহাজ বেশি চলাচল করে না—জাহাজের লাইন নয়। এগারো দিন পরে সৌরাবায়া থেকে জাহাজ যাচ্ছিল পাসারাপং,—তারা আমাদের আগুন দেখে এসে জাহাজে তুলে নিয়ে বাঁচায়।

—কিসের আগুন?

—ডুবো পাহাড়ের খানিকটা ভাঁটার সময় বেরিয়ে থাকতো। পাটের থলে জ্বালিয়ে সেখানে রোজ আগুন করতাম—অন্য জাহাজের যদি চোখে পড়ে। তাতেই তো বেঁচে গেলাম।

এ পর্য্যন্ত শুনে সুশীল বুঝতে পারলে না লোকটার ভাগ্য কিসে ফিরেছিল। তবে লোকটা যে মিথ্যে কথা বলচে না, ওর কথার ধরণ থেকে সুশীলের তা মনে হোলো। কিন্তু এইবার লোকটা যে কাহিনী বল্লে, তা শেষ পর্য্যন্ত শুনে সুশীল বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গেল—অল্পক্ষণের জন্যে সারা গড়ের মাঠ এমন কি বিরাট কলকাতা সহরটাই যেন তার সমস্ত আলোর মালা নিয়ে তার চোখের সামনে থেকে গেল বেমালুম মুছে—বহু দূরের কোন বিপদসঙ্কুল নীল সমুদ্রে সে একা পাড়ি জমিয়েচে বহুকালের লুকানো হীরে মাণিক মুক্তোর সন্ধানে—পৃথিবীর কত পর্ব্বতে, কন্দরে, মরুতে, অরণ্যে অজানা স্বর্ণরাশি মানুষের চোখের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে—বেরিয়ে পড়তে হবে সেই লুকোনো রত্নভাণ্ডারের সন্ধানে—পুরুষ যদি হও! নয় তো আপিসের দোরে দোরে মেরুদণ্ডহীন প্রাণীদের মত ঘুরে ঘুরে সেলাম বাজিয়ে চাকুরীর সন্ধান করে বেড়ানোই যার একমাত্র লক্ষ্য, তার ভাগ্যে নৈব চ, নৈব চ!

এই খালাসীটা হয়তো লেখাপড়া শেখেনি, হয়তো এর রুচি মার্জ্জিত নয়—কিন্তু এ সপ্ত সমুদ্রে পাড়ি জমিয়ে এসেচে,

ছুনিয়ার বড় বড় নগর বন্দর, বড় বড় দ্বীপ দেখতে কিছু বাকি রাখেনি—এ একটা পুরুষ মানুষ বটে—কত বিপদে পড়েচে, কত বিপদ থেকে উদ্ধার হয়েচে।

বিপদের নামে ত্রিশ হাত পেছিয়ে থাকে যারা, গা বাঁচিয়ে চলবার ঝোঁক যাদের সারা জীবন ধরে, তাদের দ্বারা না ঘুচবে অপরের ছঃখ, না ঘুচবে তাদের নিজেদের ছঃখ। লক্ষ্মী যান না কাপুরুষের কাছে, অলসের কাছে—তাদেরই তিনি কৃপা করেন যারা বিপদকে, বিলাসকে, আরামপ্রিয়তাকে তুচ্ছ বোধ করে।

জাহাজ সৌরাবায়া এসে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের ছুজনকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাওয়া হোল, সত্যিই ক্লান্তিতে, অনিদ্রায়, ছুশ্চিন্তায়, অখাদ্য কুখাদ্য ভক্ষণে ওদের শরীর ভেঙে পড়েছিল। দিনপনেরো হাঁসপাতালে শুয়ে থাকবার পরে ক্রমশঃ ওর শরীর ভাল হয়ে গেল—কাপ্তেনের মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণও ক্রমে দূর হোল।

ওদের জন্যে কিছু টাকা চাঁদা উঠেছিল, ও হাসপাতাল থেকে যেদিন বাইরে পা দিলে, সেদিন এক দয়াবতী মেমসাহেব ওকে টাকাটা দিয়ে গেলেন। ছঃস্থ নাবিকদের থাকবার জন্যে গবর্ণমেন্টের একটা বাড়ী আছে—সেখানে ওকে বিনি খরচায় থাকবার অনুমতি দেওয়া হোল।

এই বাড়ীতে সে প্রায় ছ'মাস ছিল, তারপর অন্য জাহাজে চাকরী নিয়ে ওখান থেকে চলে আসে। তারপর পাঁচ সাত বছর কেটে গেল। ও যেমন জাহাজে কাজ করে তেমনি করে

যাচ্ছে। প্রাচ্যদেশের বড় বড় বন্দরের মদের দোকান ও জুয়ার আড্ডার সঙ্গে তখন সে সুপরিচিত।

একবার তাহাদের জাহাজ ম্যানিলাতে থেমেচে। ও অন্যান্য লস্করদের সঙ্গে গিয়ে এক পরিচিত জুয়ার আড্ডায় উঠেচে—এমন সময়ে আড্ডাধারী এসে ওকে বল্লে—একবার এস তো। তোমাদের দেশের একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ও অবাক হয়ে বল্লে—আমাদের দেশের?

আড্ডাধারী চীনাম্যান হেসে বল্লে—হ্যাঁ, ইণ্ডিয়ার। এতকাল দোকান করচি বন্দরে, ইণ্ডিয়ার মানুষ চিনিনে?

ও আড্ডাধারীর পিছু পিছু গিয়ে দেখলে জুয়ার আড্ডার পেছনে একটা পায়রার খোপের মত ছোট্ট ভীষণ নোংরা ঘরে একজন লোক শুয়ে। লোকটার বয়স কত ঠিক বোঝবার যো নেই—চল্লিশও হোতে পারে, আবার ষাটও হোতে পারে। বিছানার সঙ্গে যেন সে মিশে গিয়েচে বহুদিন ধরে অসুখে ভুগে।

ওকে দেখে লোকটা ক্ষীণ কণ্ঠে তেলেগু ভাষায় বল্লে—দেশের লোককে দেখতেই পাইনে। যখন হংকং হাঁসপাতালে ছিলাম, অনেক দেশের লোক দেখতাম সেখানে। বোসো এখানে। আহা, ভারতের লোক তুমি! মুসলমান? তাতে কি? এতদূর বিদেশে তুমি শুধু ভারতের লোক, যে দেশের মাটিতে আমার জন্ম, সেই একই দেশের মাটিতে তোমারও জন্ম। এখানে তুমি আমার ভাই।

ও রোগীর বিছানার পাশে বসলো। সেই অপরিচিত মুমূর্ষু স্বদেশবাসীকে দেখে ওর মনে একটা গভীর অনুকম্পা ও মমতা জেগে উঠলো—যেন সত্যিই ও কতকালের আপনার জন।

রোগী বল্লে—আমার নাম নটরাজন্, ত্রিবেন্দ্রাম সহর থেকে এগারো মাইল দূরে কোটিউপ্পা বলে ছোট্ট একটী গ্রামে আমার বাড়ী। কোচিন থেকে যে ষ্টীমলঞ্চ ছাড়ে ত্রিবেন্দ্রাম যাবার জন্যে, সে ষ্টিমার আমার গ্রামের ঘাট ছুঁয়ে যায়। রেউয়া কাপ্পিয়াম্ নদীর ধারে, চারি ধারে ঘন বন আর ছোট ছোট পাহাড়—কোটিউপ্পা গ্রাম তুমি দেখোনি, বুঝতে পারবে না সে কি চমৎকার জায়গা। আমি অনেক দেশ বেড়িয়েচি পৃথিবীর, ভবঘুরে হয়ে চিরদিন কাটিয়ে দিলাম জীবনটা—কিন্তু আমি তোমায় বলচি শোনো, ভারতবর্ষের মধ্যে তো বটেই, এমন কি পৃথিবীর মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর একটী অদ্ভুত সুন্দর দেশ। কিন্তু আমার দেশের বর্ণনা শোনাবার জন্যে আজ তোমায় আমি ডাকিনি। আমার দিন শেষ হয়ে এসেচে, কাল যে সূর্য্যদেব উঠবে আকাশে, তা আমি চোখে বোধহয় দেখতে পাবো না—তুমি আমার দেশবাসী ভাই, একটা উপকার করবে আমার?

—কি বলুন? আপনি আমার চাচার বয়সী, যা হুকুম করবেন বলুন। সম্ভব হোলে নিশ্চয়ই করবো।

রোগীর পাণ্ডুর মুখ অল্পক্ষণের জন্যে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—নিবু নিবু প্রদীপের শেষ শিখার মত। ওর দিকে

গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—কথা দিলে ? কিন্তু ভীষণ লোভ দমন করতে হবে, ভাই।

—আল্লার নামে বলচি, যা করতে বলবেন, তাই করবো।

—আমার মাথার বালিশের তলায় একটা চামড়ার ব্যাগ আছে, সেটা বার করে নাও। আমার মৃত্যুর পরে ব্যাগটা আমার গ্রামে আমার স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেবে।

ও রোগীর মাথাটা সন্তর্পণে একধারে সরিয়ে আস্তে আস্তে একটা ছোট চামড়ার ব্যাগ বার করলে। ব্যাগের মধ্যে কতকগুলো কাগজপত্র ছাড়া আর কিছু আছে বলে মনে হোল না ওর।

বৃদ্ধ নটরাজন্ বল্লে—তোমার কাছে আমি কোনো কথা লুকুবো না, ব্যাগটার মধ্যে একখানা ম্যাপ আছে—জীবনে অনেক সাহসের কাজ করেছি, অনেক বনে জঙ্গলে ঘুরেচি—অনেক রকম লোকের সঙ্গে মিশেচি। এই ম্যাপখানা এবং ব্যাগের মধ্যে যা যা আছে—তা আমি সৎপথে থেকে হস্তগত করিনি। সংক্ষেপে কথাটা বলেনি, কারণ বেশি বলবার আমার সময় বা শক্তি নেই। আজ বিশ বাইশ বছর আগে এই ব্যাগ আমার হস্তগত হয়। যে ম্যাপখানা এই ব্যাগের মধ্যে আছে —তার সাহায্যে যে কোনো লোক দুনিয়ার মহা ধনীলোক হয়ে যেতে পারে। সুলুসি'র একটা খাড়ির ধারে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন আমলের এক নগরের ভগ্নস্তূপ আছে। সেই নগর প্রাচীন যুগের এক হিন্দু রাজ্যের রাজধানী ছিল।

তার এক জায়গায় প্রচুর ধনরত্ন লুকোনো আছে। যার কাছ থেকে এ ম্যাপ আমি পাই, সে আমারই বন্ধু, দুজনে মিলে সুলু সমুদ্রে বোম্বেটেগিরি করেছি দশ বছর ধরে। সে জাতিতে মালয়, ম্যাপ তার তৈরি—সে নিজে ওই সহরের সন্ধান খুঁজে বার করেছিল। সেখানে গিয়েছিল নিজের প্রাণ বিপন্ন করে, সামান্য কিছু পাথর ছাড়া সে বেশি কোনো জিনিস আনতে পারেনি সেখান থেকে। তার নিজের লেখা জাহাজের লগ্‌বুকের (Log Book) কয়েকখানা পাতা আমি মালয় ভাষা থেকে নিজের সুবিধার জন্যে ইংরিজিতে অনুবাদ করিয়ে নিই সোরাবায়াতে এক গরীব মালয় স্কুল মাষ্টারকে ধরে। সেই অনুবাদের কাগজখানাও এই ব্যাগের মধ্যে আছে। তারপর ম্যাপখানা হস্তগত করে আমি নিজে অনেক খোঁজাখুঁজি করি—কিন্তু সুলু সমুদ্র ও ওদিকের বহুশত বসতিহীন ও বসতিযুক্ত ছোট ও বড় দ্বীপ—তাদের প্রত্যেকটীতে ভীষণ জঙ্গল। ম্যাপও যা আছে, তা খুব নিখুঁত নয়—মোটের ওপর সে দ্বীপ আমি বার করতে পারিনি। দেশের গ্রামে আমার ছেলে আছে, তাকে নিয়ে গিয়ে ম্যাপটা আর ব্যাগ দিও। এর মধ্যে আর একটা জিনিস আছে—আমার বোম্বেটে বন্ধু সেই প্রাচীন সহরে একটা জিনিস পায়। জিনিষটা একটা সীল মোহর বলেই মনে হয়। একখানা গোটা পদ্মরাগ মণির ওপর সীলমোহরটা খোদাই করা। সেটাও এর মধ্যে আছে। সেই মোহরের ওপর যে অদ্ভুত চিহ্নটী আঁকা আছে—আমার

বিশ্বাস ছিল, সেটা একটা বড় হদিস্ ওই প্রাচীন নগরীর রত্ন ভাণ্ডারের। তাই ওখানা আমি কবচের মত গলায় ঝুলিয়ে বেড়িয়েচি এতদিন। কিন্তু আজ বুঝেছি আমার দিন শেষ হয়ে এসেচে। উনিশ বছর আগে গ্রাম থেকে যখন চলে আসি, তখন আমার ছেলে ছিল তু বছরের—আর আমার স্ত্রী পুত্রকে দেখিনি এই উনিশ বছরের মধ্যে। বেঁচে থাকলে আজ সে একুশ বাইশ বছরের যুবক। তার হাতে এগুলো সব দিয়ে বলে দিও বাপের ছেলে যদি হয়, সে যেন খুঁজে বার করে সেই নগরী, তার বাপ যা পারেনি। আর আমার কিছু বলবার নেই। ব্যাগটা নাও হাতে তুলে।

রোগী এই পর্য্যন্ত বলে ক্লান্তিতে চোখ বুজলো। চীনা আড্ডাধারীর ইঙ্গিতে ও রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

স্থশীল বল্লে—তারপর ?

—বাবুজি, যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, নটরাজন্ বাঁচলো কি মারা গেল সেদিকে কোনো খেয়াল করিনি। আমার মাথা তখন ঘুরচে। ব্যাগ খুলে দেখলাম কতকগুলো পুরোনো কাগজপত্র ও ম্যাপখানা ছাড়া আর কিছুই নেই। পদ্মরাগ মণিটা নেড়ে চেড়ে দেখে কিছু বুঝলাম না—ওসব জিনিসের আমরা কি বুঝি বলুন। কিন্তু তখন আমার আর একটা বড় কথা মনে হয়েচে। নটরাজন্ যখন ওর গল্প করছিল, আমার মনে পড়লো সাত বছর আগের সেই ঘটনা। জাহাজে সেই কলেরা হওয়া, আমার জাহাজ থেকে পালানো এবং বন

জঙ্গলের মধ্যে সেই বিন্ধ্যমুনির দেশের মধ্যে গিয়ে পড়া। বুঝলেন না বাবুজি ?

—খুব বুঝেচি, বলে যাও।

—আমার মনে হোল, আমি সেখানে গিয়ে পড়েছিলাম ঘুরতে ঘুরতে। সে পুরোনো সহর আমিও দেখেচি। নটরাজন্ যা বের করতে পারেনি, আমি সেখানে একটা গোটা দিন কাটিয়েচি। এই জায়গা সুলুসি'র ধারে তাও আমি জানি। যদিও ঠিক বলতে পারবো না কোন দ্বীপটা। জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না হয়তো—কিন্তু দূর থেকে দেখলে বোধহয় চিনবো।

—ত্রিবাঙ্কুরের সেই গাঁয়ে গেলে না ?

লোকটা বল্লে, প্রথমে ওর লোভ হয়েছিল খুব। পদ্মরাগ মণিটার দাম যাচাই করে দেখা গেল প্রায় দেড় হাজার টাকা দাম সেটার। তা ছাড়া আরও লোভ হোল, নটরাজনের ছেলেকে ম্যাপ দেবার কি দরকার ? এই ম্যাপের সাহায্যে সেই তো জায়গাটা খুঁজে বার করতে পারে। বিশেষ করে একবার যখন সেখানে সে গিয়েছিল। কিন্তু তিন চার দিন ভাববার পরে ওর মনে হোল মরবার আগে বিশ্বাস করে নটরাজন ওর হাতে জিনিসগুলো সঁপে দিয়েচে তার ছেলেকে দেবার জন্যে। এখন যদি না দেয়, তবে নটরাজনের ভূত ওর পেছনে লেগে থাকবে, হয়তো বা মেরেও ফেলতে পারে। অতএব খানিকটা ইচ্ছা

এবং খানিকটা অনিচ্ছাতে সেখানে যেতে সে বাধ্যই হোল। বড় মজার ব্যাপার ঘটলো কিন্তু সেখানে।

সুশীল বল্লে—কি রকম।

—বাবুজি, অনেক কষ্ট করে রেউয়া কা পয়াম নদীর ধারে সেই কোটিউপ্পা গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছলাম। দেখলাম নটরাজন মিথ্যে বলেনি, নদীটা একেবারে ওদের গ্রামের নীচে দিয়েই গিয়েচে বটে। নিজের পকেট থেকে যাওয়ার খরচ করলাম। গাঁয়ে গিয়ে যাকেই জিগ্যেস করি, কেউ নটরাজনের ছেলের খোঁজ দিতে পারে না। নটরাজনের কথাই অনেকের মনে নেই। দু একজন বুড়ো লোক বল্লে, নটরাজনকে তারা চিনতো বটে—তবে অনেকদিন আগে সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, তার স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে কোথায় চলে গিয়েচে তারা জানে না।

—তারপর ?

—মনে খানিকটা আনন্দ যে না হোল তা নয়। ছেলেকে যদি সন্ধান না করতে পারি তবে আমার দোষ কি। তবুও একে ওকে জিগ্যেস্ করি। শেষকালে গাঁয়ের কাছারিতে কি ভেবে গিয়ে খোঁজ করলাম। তারা শুনে বল্লে, অনেকদিন আগে নটরাজনের জায়গা জমি নীলাম করতে হয়েছিল খাজনা না দেওয়ার জন্যে। নীলামের নোটিস তারা পাঠিয়েছিল ত্রিবেন্দ্রাম সহরে।

—পেলে খুঁজে ?

—ঠিকানাটা তো খুঁজে বার করলাম। ছোট্ট একটা

কাঠের বাড়ী, নারকেল গাছের বাগান সামনে। সহরের মধ্যে বাড়ীটা নয়, সহর থেকে মাইল খানেক দূরে। অনেক ডাকাডাকির পরে এক বুড়ী এসে দোর খুলে দিলে। মাথার চুল সব সাদা হয়েচে অথচ মুখ দেখে খুব বয়স হয়েচে বলে মনে হয় না। বল্লে—কাকে চাও? আমি বল্লাম—নটরাজনের ছেলের সঙ্গে দেখা করতে এসেচি। বুড়ী আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বল্লে—ও নাম কোথায় শুনলে? ও নাম তো কেউ জানে না। আমি তখন সব কথা বুড়ীকে বল্লাম। শুনে বুড়ী কেঁদে ফেললে। বল্‌লে—আমার ছেলেও আজ নিরুদ্দেশ, তার বাপের মত সেও বেরিয়েচে—আজ তিন বছর হয়ে গেল। কোনো খবর পাইনি।

—তুমি কি করলে?

এই কথা শুনে আমার বড় কষ্ট হোল, বাবুজি। আমি সেখানে বুড়ীর বাড়ী সাত-আটদিন রইলাম। তাকে মা বলে ডাকি। বুড়ীও আমায় বড় যত্ন করতে লাগলো। বুড়ী বড় গরীব—ভাড়াটে ঘরে থাকে। তার ছেলে স্কুলে পড়তো। সে রাঁধুনিগিরি করে ছেলের পড়ার খরচ ও নিজেদের খরচ চালাতো। এখনও সে নারকেলতেলের গুদামের শেঠজীদের বাড়ী রাঁধে। কোনোরকমে একটা পেট চলে যায়। বুড়ীকে পদ্মরাগ মণিটা আমি দেখাইনি—

—এত কষ্ট করে গিয়ে ওটার বেলা ফাঁকি দিলে?

—ওই যে নটরাজন্ বলেছিল, পদ্মরাগ মণির গায়ে একটা

আঁক-জোক আছে—যা হদিস্ দেবে হীরেজহরতের—ওই হোল ওখানা না দেওয়ার গোড়ার কথা। ভাবলাম কি জানেন? ভাবলাম এই, নটরাজনের ছেলে না পাত্তা—বুড়ীর কাজ নয় ম্যাপ দেখে সুলু সি যাওয়া আর সেই দ্বীপের মধ্যে পুরোণো সহর খুঁজে বার করা। যদি ওকে দিই ওগুলো এখানে পড়ে নষ্ট হবে। তার চেয়ে যদি আমি নিই, হয়তো চেষ্টা করলে একদিন না একদিন আমি সেখানে গিয়ে পৌঁছুতেও পারি। যদি হীরে জহরত পাই, বুড়ীকে আমি ভালভাবে খোরপোশ দিয়ে রাখবো। কিন্তু যদি পদ্মরাগ মণিখানা দিয়ে দিই—তবে হদিস্‌টা হাতছাড়া হয়ে গেল। বুড়ী এখুনি অপরকে মণি বিক্রী করবে। যে কিনবে, সে মণির গায়ে আঁকা সীলমোহরের কোনো মানেই বুঝবে না। লোহার সিন্দুকে আটকা থাকবে জিনিষটা। তাতে কারো কোনো উপকার নেই। কি বলেন আপনি?

—তোমার যুক্তি মন্দ না। যদিও আমার মনে হয় জিনিষটা দেওয়াই তোমার উচিত ছিল। যাদের জিনিষ, তারা সেটা নিয়ে যা খুসি করুক না কেন। তোমার ওপর শুধু পৌঁছে দেওয়ার ভার। সেটা তুমি রাখলে নিজের কাছে?

—হাঁ বাবুজি। এই দেখুন আমার কাছেই আছে। আসুন ওই আলোর কাছে।

সুশীল আলোর নীচে গিয়ে বিস্ময় ও কৌতূহলের সঙ্গে ওর প্রসারিত করতলের ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়লো। মস্ত

একখানা পাথর, একটু চেপ্টা গড়নের, উজ্জ্বল সবুজ রংয়ের—তার ওপর খোদাই কাজ করা।

সুশীল ওর হাত থেকে সীলমোহরটা নিয়ে দেখলে উল্টেপাল্টে। খোদাই কাজ করা এত বড় পাথর সে কখনও দেখেনি। বড় সাইজের একটা সবুজ-রংয়ের কলার লেবেঞ্চুসের মত। সীলমোহরের মধ্যে চেয়ে সে অবাক হয়ে গেল—বড় একটা ওঁকারের 'ও'র লেজ জড়িয়ে জড়িয়ে পাকিয়েচে একটা বটগাছ কিংবা অন্য কোনো গাছকে। তারপর সে আরও ভাল করে চেয়ে দেখলে—আসলে ওটা ওঁকার নয়, যদিও সেইরকম দেখাচ্ছে বটে। কোনো নাগ-দেবতার মূর্ত্তি হওয়াও বিচিত্র নয়। ত্রিভুজাকৃতি কি একটা আঁকা রয়েচে ছবির বাঁ দিকে। কোনো নাম বা সন তারিখ নেই।

লোকটা বল্লে—কিছু বুঝলেন বাবু?

—নাঃ, তবে হিন্দুর সঙ্গে এ জিনিষের সম্পর্ক আছে বলে মনে হোল। দেড় হাজার টাকার জিনিষটা তুমি যে বড় বিক্রী করে ফেলনি এতদিন?

—ওই যে নটরাজন বলেছিল এই খোদাই করা আঁক-জোকের মধ্যে আসল মালের হদিস্ পাওয়া যাবে—সেই লোভেই একে হাতছাড়া করে ফেলিনি।

—নটরাজনের স্ত্রী কোথায়?

—তাকে কোটিউপ্পা গাঁয়ে পাঠিয়ে দিয়েচি। মাসে মাসে টাকা পাঠাই। সহরে খরচ বেশী, গাঁয়ে খরচ কম। ঘর ভাড়া

লাগে না। এই সেদিনও পাঁচটাকা ডাকে পাঠিয়েচি। এখন চাকুরী নেই—নিজের পেটই চলে না।

—কাগজপত্র আর ম্যাপগুলো।

—ওই নটরাজনের স্ত্রী—তাকে আমি মা বলি—সেখানে তার কাছেই আছে। সঙ্গে নিয়ে বেড়াইনে, বড্ড দামী ও দরকারী জিনিষ—আমার কাছে থাকলে হারিয়ে যেতে পারে। সে বুড়ী তার বেতের পেঁটরায় তুলে রেখে দিয়েছে, যখন দরকার হবে, নিয়ে আসবো গিয়ে।

—এসব আজ কত বছরের কথা হোল ?

—বেশি দিনের নয়। আজ দুবছর আগে আমি নটরাজনের গাঁয়ে গিয়ে বুড়ীর সঙ্গে প্রথম দেখা করি।

—তোমাকে একটা পরামর্শ দিই শোনো। এই মাণিকখানা বিক্রী করে ফেলে টাকাটা নটরাজনের স্ত্রীকে দাওগে। তার জীবনটা একটু ভালভাবে কাটবে। দেড় হাজার টাকা হাতে পেলে সে খুব খুশি হবে। তাদেরই জিনিষ ধর্ম্মতঃ দেখতে গেলে, তোমার নিজের কাছে রাখা মানে চুরি করা।

—কিন্তু বাবু তাহোলে হদিস্ চলে গেল যে !

—যাবে না। প্যারিস্ প্লাষ্টারের ছাঁচে ওটা তুলে নিলেই চলে। ওই ছবিটার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক। মাণিকখানা যার জিনিষ, তাকে দাও ফিরিয়ে। তুমি যখন মা বলে ডাকো, তখন তাঁর আশীর্ব্বাদ তোমার বড় দরকার। এমারেল্ডখানা যদি বুড়ী বিক্রী করে, যে কিনবে সে ওর খোদাই ছবির

কোনো মানে করতে পারবে না। তার কোনো কাজেই লাগবে না।

—বেশ বাবুজি, আপনিই কাজটা করিয়ে দিন না?

—কাল এটা সঙ্গে করে নিয়ে আমার এখানে দেখা কোরো। আমার একটা জানাশুনা লোক আছে. সে এই সব কাজ করে—তাকে দিয়ে করিয়ে দেবো।

রাত হয়ে গিয়েছিল। সুশীল মাঠ থেকে ফিরতে ফিরতে কত কথাই ভাবলে। তার মাথার মধ্যে যেন কেমন করচে। এ যেন আরব্য উপন্যাসের কাহিনীর মত অদ্ভুত। এমনভাবে গড়ের মাঠে বেড়াতে বেড়াতে একজন মুসলমান লস্করের সঙ্গে দেখা হবে—সে তাকে এমন একটি আজগুবি গল্প বলে যাবে—এ কখনো সে ভেবেছিল? গল্পটা আগাগোড়া গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতেও পারতো সে, যদি ওই এমারেল্ডের সীলমোহর-খানা সে না দেখতো নিজের চোখে।

লোকটার গল্প যে সত্যি, তা ঐ পাথরখানা থেকে বোঝা যাচ্ছে। সন তারিখ ও জায়গা মিলিয়ে এমনভাবে সে গল্প বলে গেল—যা অবিশ্বাস করা শক্ত। সুশীল ওকে শেষের দিকে যে প্রশ্নটা করেছিল, অর্থাৎ কতদিন আগে বুড়ীর সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল, সেটা শুধু সময় সম্বন্ধে তাকে জেরা করা মাত্র।

সুশীল বাড়ী গিয়ে সনৎকে বল্লে—এই কলকাতা সহরেই অনেক মজা ঘটে যায় দেখচি। সনৎ বল্লে—কি দাদা?

—সে একটা অদ্ভুত গল্প। যদি বলবার দরকার বুঝি তবে বলবো—

পরদিন গড়ের মাঠে আবার সে নির্দ্দিষ্ট জায়গাটিতে বসে রইল। একটু পরে জামাতুল্লা খালাসী এসে ওর পাশে নিঃশব্দে বসে পড়লো। বল্লে—আমার কথা ভাবলেন বাবুজী?

—চলো আমার সঙ্গে। একটা ছাঁচ তোমাকে করিয়ে দিই। এনেচ ওটা?

—হাঁ বাবুজী। দেখুন, আমি ভিক্ষে করে খাচ্চি আজ দুমাস, তবুও এত বড় দামি পাথরটা বিক্রি করিনি শুধু বড় একটা লাভের আশায়। কিন্তু যত দিন যাচ্চে, তত আমার মনে হচ্চে নসিব আমার খারাপ, নইলে সেই জায়গায় গিয়েও তো কিছু করতে—

—জামাতুল্লা, তুমি লেখাপড়া জানা লোক না হলেও খুব বুদ্ধি আছে। একা তুমি কিছু করতে পারবে না তা বেশ বোঝো। এ কাজে টাকা চাই, লোক চাই, জাহাজ চাই। অনেক টাকার খেলা সে সব। তোমার অত টাকা নেই। মিছে কেন নটরাজনের স্ত্রীর পাওনা জিনিষ থেকে তাকে বঞ্চিত করবে?

দু'একদিনের মধ্যে প্যারিস প্লাষ্টারের ছাঁচটা হয়ে গেল। সুশীল প্রাচীন ধনীবংশের সন্তান, ওর যে বন্ধু ছাঁচ গড়িয়ে দিলে, সে ভাবলে ওদের পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তি এটা। ফেরৎ

দেওয়ার সময় সে বল্লে—এটা আমার এক বন্ধুকে একবার দেখতে দেবে ?

—কেন বল তো ?

—আমার সে বন্ধু মিউজিয়মে কাজ করে। পণ্ডিত লোক। যদি গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে এটা কিনে নেওয়া হয়, তাই বলচি।

—তাকে তোমার ষ্টুডিওতে কাল বিকেলে নিয়ে এসো।

পরদিন জামাতুল্লাকে নিয়ে সুশীল বন্ধুর ষ্টুডিওতে গিয়ে দেখলে একটি সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক সেখানে বসে আছেন।

বন্ধুটি বলে উঠলো—এই যে এসো সুশীল, ইনি এসে অনেকক্ষণ বসে আছেন—আলাপ করিয়ে দিই ডাঃ রজনীকান্ত বসু এম, এ ; পি, এইচ, ডি—মিউজিয়মে সম্প্রতি চাকুরীতে ঢুকেছেন।

কিছুক্ষণ পরে ডাঃ বসু এমারেল্ডের সীল মোহরের ওপর ঝুঁকে পড়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বিস্ময়ে প্রায় চীৎকার করে উঠে বল্লেন—এ জিনিসটা আপনি পেলেন কোথায় ?

সুশীলের আর্টিষ্ট বন্ধু বল্লে—ওটা ওদের বংশের জিনিস। ওরা পল্লীগ্রামের প্রাচীন ধনী বংশ।

ডাঃ বসু সন্দিগ্ধ মুখে বল্লেন—কিন্তু এ তো তা নয়। এযে বহু পুরোনো জিনিস। এ আপনারা পেয়েছিলেন কোথায় তার ইতিহাস কিছু জানেন ? যদি বলতে বাধা না থাকে—

সুশীল বল্লে—না ডাঃ বসু, আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবো না। আপনি কি আন্দাজ করচেন ?

ডাঃ বসু বল্লেন—দেখুন সীল মোহরের ওপর এ চিহ্ন আমি নিজে কখনো দেখিনি—তবে এই ধরণের পাথরের ওপর সীলমোহর ওঁকার ভাটে পাওয়া গিয়েচে। ফরাসী ইন্দো-চীনের জঙ্গলের মধ্যে বহু পুরোনো নগরের ধ্বংসস্তূপে। এর সময় নির্দ্দিষ্ট হয়েচে মোটামুটি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী। আমাদের মিউজিয়ামেও আছে—কাল যাবেন, দেখাবো। কিন্তু আপনার এটা আরো পুরোনো, আমি একে নির্ভয়ে নবম শতাব্দীতে ফেলে দিতে পারি—কিংবা তারও আগে।

সুশীল বল্লে—আপনার তাই মনে হয় ?

—নিশ্চয়ই। নইলে বলতাম না। আর সেই জন্যেই আপনাকে জিগ্যেস করচি আপনাদের পূর্ব্বপুরুষে এটা পেলেন কি করে ? এ হোল সমুদ্রপারের জিনিষ। বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ের আমগাছের ছায়ায় শান্ত ও নিরীহ জিনিস নিয়ে কারবার—কিন্তু এ সীলমোহরের পেছনে রয়েচে অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার দুর্দ্দান্ত সাহস, দুর্জ্জয় বিক্রম, যুদ্ধ, রক্তপাত—ভারতবাসী যেদিন সমুদ্রের ওপারে বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল সেই সব দিনের ইতিহাস এ সীলমোহরের সঙ্গে জড়ানো। তাই বলচি এটা আপনারা পেলেন কি করে ?

ডাঃ বসুর বাড়ী থেকে বার হয়ে আসবার সময়ে সুশীলের মনে টাকার স্বপ্ন ছিল না।

ছিল যে সুদূরের, দুঃসাহসিক অভিযানের স্বপ্ন—জামাতুল্লা খালাসীর অত বড় পদ্মরাগ মণিখানার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না।

সে এমন একদিনের স্বপ্ন—যা প্রত্যেক ভারতবাসীর আত্ম-সম্মানকে জাগ্রত করে, তরুণদের প্রাণে নতুন আশা, উৎসাহ ও আনন্দের সংবাদ আনে বয়ে—

তবুও তো তা সুশীলের মনে যে ছবি জাগালে—তা আদৌ স্পষ্ট নয়—সবই আবছায়া, সবই ধোঁয়া ধোঁয়া। সুশীল ইতিহাসের ছাত্র নয়। ডাঃ বসুর শেষ কথা ক'টীর সঙ্গে যেন এক অদ্ভুত বৈদ্যুতিক শক্তি মেশানো ছিল—তার চোখের সামনে প্রাচীন কালের সুদীর্ঘ অলিন্দ বেয়ে তলোয়ার হাতে বর্ম্ম চর্ম্মে সুসজ্জিত বীরের দল সারি সারি চলেছে, মৃত্যুকে তারা ভয় করে না—অজানা সমুদ্রপথে তাদের বিজয় অভিযান নব উপনিবেশের ইতিহাস সৃষ্টি করে ভাবীকালের অসহায় ও অকর্ম্মণ্য সন্তানদের শিরার শিরায় নতুন রক্তের আলোড়ন এনে দেয়!

কোথায় সে পড়ে আছে পাড়াগাঁয়ে, পুরোণো জমিদার ঘরের বিলাসপুষ্ট আয়েসী ছেলেটী সেজে—তাদেরই পূর্ব্বপুরুষ একদিন যে অসি হাতে সপ্ত সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছিল—তাদেরই স্বজাতি, স্বদেশবাসী—আর সে থাকবে দিব্যি আরামে তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে শুয়ে, তেলে জলে, দাদখানি চালের ভাত আর মাছের ঝোলে কোনোরকমে পৈতৃক বাঙালী প্রাণটুকু বজায় রেখে চলবে টায় টায়।

চিরকাল হয়তো এমনি কেটে যাবে তার।

প্রজা ঠেঙিয়ে খাজনা আদায় করে, পুরোণো চণ্ডীমণ্ডপে বসে তামাক টেনে আর পাল-পার্ব্বণে গ্রাম্য লোকজনের পাতে দই মোণ্ডা দিয়ে হাততালি অর্জ্জন করবার প্রাণপণ চেষ্টায় মশগুল হয়ে!

তারপর আছে মামলা মোকর্দ্দমার তদারক করতে কোর্টে ছুটোছুটি—ডিক্রি, নালিশ, কিস্তিবন্দী, সই মোহরের নকল, সমনজারি—উঃ! ভাবলে তার গা কেমন করে। প্রাচীন ধনী বংশের লাল খেরো বাঁধানো রোকড় ও খতিয়ানের চাপে সে নিজের যৌবন ও জীবনকে একদম পিষে মেরে ফেলে শেষের দিকে যখন মহকুমার হাসপাতালে একটী মাত্র রোগী থাকবার স্থানের টাকা জেলাবোর্ডের হাতে দেবে তার স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মৃতি রক্ষা কল্লে—তখন হয়তো সে পাবে রায়সাহেব বা রায় বাহাদুর খেতাব।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভাববে এইতো জীবনের পরম সার্থকতা সে পেয়ে গেছে।

না দেখবে দুনিয়া—না দেখবে জীবন, ঠুলিপরা বলদের মত ঘানিগাছের চারিধারে ঘুরেই জীবন কাটাবে।

রাত্রে সে সনৎকে ডেকে বল্লে—সনৎ, তোর সাহস আছে?

—কেন দাদা?

—আমি যদি বিদেশে বেরুই, আমার সঙ্গে যাবি?

—এখুনি—যদি নিয়ে যাও।

—অনেক দূরে হোলেও ?

—যেখানে বলো।

—বাড়ীর জন্যে মন কেমন করবে না ?

—আমি পুরুষ মানুষ না দাদা ? ও কথাই ওঠে না।

—আমি এম্‌নি জিগেস্ করচি—

পরদিন সে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে বসে পড়লে পুরোণো দিনের বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস। যে সব কথা সে জানতো না, কোনোদিন শোনেওনি—ডাঃ বসুর কথায় তার ইচ্ছে গেল সেগুলো জানবার ও পড়বার।

বিজয়সিংহের সিংহল বিজয়ের কাহিনী, চম্পা রাজ্যের কথা—সুদূর সমুদ্রপারের ভারতীয় উপনিবেশ চম্পা। ভারতবাসী অসির তীক্ষ্ণাগ্রভাগ দিয়ে যে দেশের মাটী পাথরের গায়ে নাগরাজ বাসুকি, শিব-পার্ব্বতী ও বিষ্ণুমূর্ত্তি অমর করে রেখেচে।

জামাতুল্লা খালাসীকে সে একশোবার ধন্যবাদ জানালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে বসে পড়তে পড়তে।

সে তো পাড়াগাঁয়ে অলস জীবন যাপন করছিল—

কোনদিন এসব কথা সে জানতেও পারতো না—এত বড় ছবি তার মনে কোনো-দিন জাগতোও না—যদি দৈবক্রমে জামাতুল্লা খালাসী সেদিন তার পাশে এসে বসে দেশলাই না চাইতো।

তুচ্ছ এক পয়সার দেশলাই।

পড়ার টেবিলে বসে বসেই সুশীলের হাসি পেল কথাটা ভেবে।

ইম্পিরিয়াল্ লাইব্রেরী থেকে বার হয়েই জামাতুল্লা খালাসীর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

মাঠের মধ্যে সে নির্দ্দিষ্ট জায়গাটীতে বসে আছে। সুশীলকে দেখে সে বল্লে—আসুন বাবু, কাল রাতে এক কাণ্ড হয়ে গেছে!—আপনার সঙ্গে দেখা করবো বলে—

সুশীল বাধা দিয়ে বল্লে—কি—কি?

জামাতুল্লা বল্লে—সে এক আজগুবি কাণ্ড বাবু—

—কি রকম ব্যাপার?

—আপনার সেই বন্ধুর বাড়ী থেকে পাথরখানা নিয়ে কাল ফিরচি বাবু, মেটেবুরুজের কাছে ছোট মোল্লাখালি বলে যে বস্তি, ওই বস্তির কাছে আমার এক দোস্ত থাকে। ভাবলাম, চা খেয়ে যাই। সেখানে একেবারে মানুষ নেই—ফাঁকা মাঠ, সিকিমাইল দূরে ছোট মোল্লাখালি বস্তি। হঠাৎ বাবু আমার মনে হোল আমার দম বন্ধ হয়ে আসচে, কে যেন আমার গলা দুহাত দিয়ে চেপে ধরে আমায় মেরে ফেলবার চেষ্টা করচে—আমি তো চেঁচিয়ে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম—কিন্তু পড়ে গেলাম চিৎপাত হয়ে মাঠের মধ্যে—পেছনে সে সময় পায়ের শব্দ শুনলাম যেন—

সুশীল ব্যস্ত হয়ে বল্লে—হীরেখানা আছে তো?

—শুনুন বাবু তারপর। আমি এমন কাণ্ড কখনো

দেখিনি। চিৎপাত হয়ে পড়ে আর জ্ঞান নেই। যখন জ্ঞান হোল তখন দেখি আমার চারিপাশে দুতিন জন লোক দাঁড়িয়ে, তারা কেউ পানি এনে আমার চোখে মুখে দিচ্চে, কেউ গামছা নেড়ে বাতাস করচে। আমি আমার দোস্তর নাম বলতে তারা আমায় ছোটমোল্লাখালি নিয়ে গেল তার বাড়ীতে। সেখানে গিয়ে তখন আমার হুঁস্ বেশ ভাল ফিরে এল, আমি পকেটে হাত দিয়ে দেখি হীরে নেই!

—বল কি। নেই। গেল সেখানা!

—শুনুন বাবু আজগুবি কাণ্ড। হীরে নেই দেখে তো আমি আবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম। দোস্তর বাড়ী তো সোরগোল পড়ে গেল। কত লোক দেখতে এল—আমার দোস্ত কতবার মুখ চোখে পানি দিয়ে ডাক্তার ডেকে আমায় চাঙ্গা করলে। আমি সেই রাত্রেই বাড়ী চলে গেলাম—

—তারপর?

—বাবু, আপনি বলুন একটা কথা। আমি কাল আপনার দোস্তর কাছে দেখাতে গিয়েছিলাম কি নিয়ে? যে ছাঁছ তৈরী হয়েছিল তাই নিয়ে—না আসল হীরেখানা নিয়ে? আপনার ওই যে দোস্ত খুব এলেমদার লোক তার কাছে?

—ও, ডাঃ বসুর কাছে তুমি তো আসল পাথরখানা নিয়ে গেছলে—

—ছাঁচখানা নিয়ে যাইনি ঠিক তো? কিন্তু বাবু বাড়ী ফিরে দেখি আসল পাথরখানা পকেটে রয়েছে ছাঁচখানা নেই।

সুশীল হো-হো করে হেসে বল্লে—এ কোনো আজগুবি কাণ্ড হোল না জামাতুল্লা। তুমি দুখানাই নিয়ে গেছলে। যে তোমার গলা টিপেছিল সে ছাঁচখানাকে ভুল করে নিয়ে গেছে—আসলখানা তোমার পকেটেই রয়ে গিয়েছিল। কোন্ পকেটে কোন্‌টা রেখেছিলে মনে আছে ?

—বাবু আমি ছাঁচটা নিয়েই যাইনি—

—আমি বলচি শোনো। তুমি ভুলে দুটোই নিয়ে গেছলে। কিন্তু এ থেকে আমাদের সাবধান হোতে হবে। কেউ আমাদের পাথরের খবর পেয়েছে—কলকাতা গুণ্ডা বদমাইসের জায়গা—আমরা ক'দিন ধরে এখানে পাথরের কথা বলেচি, তত সাবধান হইনি। এখানেও শুনতে পারে, সেদিন ডাঃ বসুর ওখানে দুটো আরদালি দাঁড়িয়ে ছিল—আমার সন্দেহ হয় তাদের মধ্যে কেউ শুনতে পারে। যাক্, ভালই হয়েচে যে আসলখানা চুরি যায়নি। আজ তোমার সঙ্গে নেই তো সেখানা ?

—না বাবু। আমি কি আর তেমনি উজবুক্ ?

—লোক লেগেচে আমাদের পেছনে। খুব সাবধানে চলাফেরা করবে।

জামাতুল্লা হেসে বল্লে—বাবু, লোক লেগে আমায় হঠাৎ কিছু করতে পারবে না। সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়িয়েচি—কত বদ্‌মাইস লোকের সঙ্গে কতবার কারবার করেছি। এই হাত দুটো যে দেখচেন—এ'দুটো ঠিক থাকলে এর সামনে কেউ এগুতে পারবে না জানবেন খোদার দোয়ায়।

সুশীল একবার চারদিকে চেয়ে দেখলে—কোনদিকে কোনো লোক নেই। সঙ্গীকে চুপি চুপি বল্লে—এসব কথা এখন নয়। তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারবে ?

—কোথায় বাবুজি ?

—আমার বাসায়। সেখানে ঘরের মধ্যে বসে সব কথা হবে এখন।

জামাতুল্লাকে সঙ্গে নিয়ে সুশীল তাদের বাসায় এল। আসার পথে কোনো কিছু অঘটন ঘটে নি দেখে সুশীলের মন থেকে ভয় ও বিপদাশঙ্কা অনেকখানিই চলে গেল। জামাতুল্লাকে কিছু খেতে দিয়ে ও তার জন্যে বাইরের ঘরের কোণে বিছানা করে দিলে।

জামাতুল্লা বল্লে—বাবুজি, বিছানা কেন ?

—রাত্রে এখানে তোমায় রাখবো। যেতে দেবো না মেটেবুরুজে। সাবধানের মার নেই। খিদিরপুরের মাঠ থেকে মেটেবুরুজ পর্য্যন্ত জায়গা বড্ড নির্জ্জন—গুণ্ডা বদমাইসদের আড্ডা। রাত্রে সে পথে গেলে বিপদ আছে। তোমার যত সাহসই থাকুক—রাত্রে যাওয়া হবে না।

সুশীলের এ সতর্কতার জন্যে জামাতুল্লাকে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকতে হয়েছিল।

রাত্রে আহারাদির পরে সুশীল জামাতুল্লাকে বল্লে—আমার মতলব তোমাকে বলবো বলেই তোমায় ডেকেচি। আমার মনে হয়েচে আমরা যে করেই হোক—চল সেই বনের মধ্যে

প্রাচীন নগরের সন্ধানে বেরুই। টাকাকড়ির সন্ধান আমি করচি নে—পাই ভালো। তা আমি একা নেবো না—নটরাজনের স্ত্রীর শেষ দিনগুলো যাতে সুখে স্বচ্ছন্দে কাটে তার ব্যবস্থা করবো তা দিয়ে। তারপরে তুমি আছ, আমি আছি। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমার ঘরে খাবার ভাবনা নেই।

জামাতুল্লা খালাসী ঘাড় নেড়ে বল্লে—সে আমি আগেই জানি বাবু—আপনি রইস্ আদ্‌মি—মানুষ দেখেই চিনতে পারি। নইলে আপনাকে এত বিশ্বাস করতাম না। বড় ঘরানা আপনারা, আপনাদের নজর হবে বড়।

—তা ছাড়া কি জানো জামাতুল্লা? এই বয়েস হচ্ছে বিদেশ বেড়ানোর সময়। চিরকাল বাড়ী বসে থাকবো যদি, তবে দুনিয়া দেখবো কবে?...তোমার সাহস আছে আমায় সেখানে নিয়ে যাবার তো?

—এ বাবুজি সাহসের কথা নয়। জাহাজ চালানো বিদ্যের কথা—কৌশলের কথা। সিঙ্গাপুরে আমার এক দোস্ত আছে তাকে খুঁজে বার করতে হবে। সে সুলুসিতে জাহাজ চালিয়েচে অনেকদিন—আপনার কাছে ছিপাবো না, বোম্বেটের কাজ করতো সে। এখন বড্ড কড়া শাসন, ওলন্দাজ সরকার আর আমাদের ইংরেজ সরকারের। মানোয়ারী জাহাজ সর্ব্বদা ঘুরচে। বোম্বেটে জাহাজ ধরতে পারলেই ধরে নিয়ে আসবে—আর গুলি করবে। সেজন্যে সে কাজ ছেড়ে দিয়ে দোকান করে বসে আছে সিঙ্গাপুরে। তাকে সঙ্গে নিতে হবে।

—তা হোলে কি রকম ব্যবস্থা করবে যাবার ?

—আপনি টাকা কত নিতে পারবেন বলুন।

—শ' পাঁচেক। তার বেশি একপয়সা নয়।

—তা ও নেবেন না। আপনি আমার দোস্ত—তুশো টাকা নিয়ে চলুন। আমি পাথর বিক্রি করে ফেলি—সেই টাকায় চালাবো।

সে টাকা তোমায় আমি নিতে দেবো না জামাতুল্লা, নটরাজনের স্ত্রীকে বঞ্চিত করে সে পাথর নিয়ে আমাদের ফল ভাল হবে না। নটরাজন স্বর্গে থেকে দেখবে আর অভিশাপ দেবে।

—এই জন্যেই তো বলি রইস্ আদমির বুদ্ধি আর আমাদের বুদ্ধি! আপনি যা বলবেন বাবুজি।

অনেক রাত হয়েছিল। জামাতুল্লার বিশ্রামের বন্দোবস্ত করে দিয়ে সুশীল নিজে শোবার জন্যে চলে গেল বটে—কিন্তু তার সারা রাত ঘুম এল না চোখে। এবার কি ক্ষণে সে বাড়ী থেকে বার হয়েছিল—সাগর পারের যাত্রী হয়ে যদি সেই অজানা দ্বীপে অরণ্যের মধ্যে প্রাচীন যুগের হিন্দু কীর্ত্তি শুধু চোখের দেখা দেখে আসতে পারে—তবেই সে জীবন সার্থক বিবেচনা করবে। চম্পারাজ্যের মত সেখানেও আর এক হিন্দু উপনিবেশ ছিল নিশ্চয়ই—মহাকালের চক্রনেমির আবর্ত্তনে অরণ্য গ্রাস করেচে সে নগরী—তবুও ভারতের সন্তান সে, প্রাচীন যুগের সেই পুণ্যভূমির পবিত্রধূলি স্পর্শ করে সে ধন্য হতে চায়।

অর্থের জন্যে সে যাচ্চে না।

পরদিন সকালে উঠে সুশীল জামাতুল্লাকে চা ও খাবার খেতে দিয়ে তার সঙ্গে গল্প করতে বসেচে—এমন সময় কাগজওয়ালা খবরের কাগজ দিয়ে গেল ; সুশীল কাগজ খুলে সংবাদগুলোর ওপর সাধারণ ভাবে চোখ বুলোতে গিয়ে হঠাৎ উত্তেজিত সুরে বলে উঠলো—জামাতুল্লা, আরে তোমাদের মেটেবুরুজে খুন !···

জামাতুল্লা চা খেতে খেতে চমকে উঠে বল্লে—কোথায় বাবু কোথায় ?

—দু নং মফিজুল সর্দ্দারের লেন, একটা কুঠুরীতে নূর মহম্মদ নামে একটা লোককে গলা-কাটা অবস্থায় পাওয়া গিয়েচে—

সুশীল কাগজ থেকে মুখ তুলে দেখলে জামাতুল্লা তাল পাতার মত কাঁপছে—অতি কষ্টে সে সুশীলকে জিজ্ঞেস করলে —কি নাম লোকটার বাবুজি ?

—নূর মহম্মদ—

জামাতুল্লা চা ফেলে উঠে এসে সুশীলের হাত ধরে বল্লে—আপনি আমার সব চেয়ে বড় দোস্ত—কাল এখানে রেখে আপনি আমার জান বাঁচিয়েচেন—নূর মহম্মদ আমার ঘরেই থাকে। এক বিছানাতে দুজন শুই—কাল আমি থাকলে আমাকেই মারতো, আমি ভেবে ভুল করে ওবেচারীকে খুন করে গিয়েচে—

জামাতুল্লার বোম্বেটে বন্ধু তো দেখা যাচ্চে অত্যন্ত ধূর্ত্ত প্রকৃতির লোক—ও হাসতে হাসতে মানুষ খুন করতে পারে। ওকে কি খুব বিশ্বাস করা উচিত হোল?

—বিশ্বাস না করেই বা উপায় কি দাদা? ও ছাড়া সুলু সমুদ্রে জাহাজ চালাবে কে? তবে আমার মনে হয় যখন আমাদের কাছে এমন কোনো মূল্যবান জিনিষ নেই—তখন সে অনর্থক মানুষ খুনের দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে যাবে কেন?

এমন সময় বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। জামাতুল্লা তার বোম্বেটে বন্ধু মিঃ ইয়ার হোসেনকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। ইয়ার হোসেন ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীটে একটা চুল-ছাঁটা দোকান করে ভাড়াটে চীনে নাপিত দিয়ে চুল ছাঁটে—রোজগার মন্দ হয় না। বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছর বয়স হবে, রোগা চেহারা—চোখের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ভাল মানুষ ও নিরীহ ধরণের বলে মনে হয়—পরণে সাহেবী পোষাক। লোকটা ভারতীয় নয়, মালয়ও নয়—কোন্ দেশের লোক তা কখনো বলেনি। তবে তার কথাবার্ত্তা থেকে মনে হয় ভারতের ওপর টানটা তার বেশি। কথাবার্ত্তা বলে ইংরাজিতে, নয়তো মালয় ভাষায়। তার ভাঙ্গা ইংরিজি জামাতুল্লা বেশ বোঝে।

এ ধরণের লোকের সঙ্গে কখনো সুশীল বা সনতের পরিচয় ঘটেনি ইতিপূর্ব্বে। বাইরে মোটামুটি ভদ্রলোক এমন কি বেশ নিরীহ প্রকৃতির প্রৌঢ় ভদ্রলোক—কিন্তু ভেতরে ভেতরে ইয়ার হোসেন দুর্দ্দান্ত দস্যু। মুহূর্ত্তের মনোমালিন্যের

ফলে যারা বন্ধুর বুকে অতর্কিতে তীক্ষ্ণধার কিরীচ বসিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা করে না—এ সে জাতীয় লোক !

ইয়ার হোসেন ঘরে ঢুকে বল্লে—বসে আছেন ? আমায় আর ত্বশো টাকা দিতে হবে—দরকার রয়েচে।

সুশীল জামাতুল্লার মুখের দিকে চাইলে অতি অল্পক্ষণের জন্যে। জামাতুল্লার চোখের ইঙ্গিত তাকে বলে দিলে ইয়ার হোসেনকে যেন সে প্রত্যাখ্যান না করে।

—কত টাকা বল্লেন মিঃ হোসেন ?

—ত্বশো কি আড়াইশো—

—বেশ নেবেন। সেদিন নিয়েচেন একশো—

ইয়ার হোসেন যেন খানিকটা উদ্ধত সুরে বল্লে—নিয়েচি তো কি হবে ? তোড়যোড় করতেই সব টাকা যাচ্চে—

—জাহাজের কি হোল ? চার্টার করবেন ?

—জাহাজ চার্টার করবার টাকা কোথায় ? কিন্তু আচ্ছা একটা কথা বলি। আপনারা সে বিক্ষমুনির দেশে যেতে চাইচেন কেন ? টাকা-কড়ি হীরে-জহরৎ সেখানে সত্যি আছে ?

—কি করে বলি সাহেব। তবে তোমার কাছে লুকুবোনা। খুব বড় রত্নভাণ্ডার সেখানে লুকোন আছে এই আমাদের বিশ্বাস। ওই মণির ওপর আঁক জোঁক আছে—ওটাই তার হদিস— অন্ততঃ নটরাজন তাই বলেছিল।

—আমি চেষ্টা করে দেখবো—কিন্তু আমার ভাগ ঠিক তিন ভাগের এক ভাগ চাই। ফাঁকি দেবার চেষ্টা করলেই

বিপদ ঘটবে। এই হাতে অনেক মানুষ খুন করেছি, সে কথা কে না জানে? মানুষ মারাও যা, আমার কাছে একটা পাখী মারাও তা।

সুশীলের গা যেন শিউরে উঠলো। কাজের খাতিরে এমন নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকের সঙ্গে আজ তাকে মিশতে হচ্চে—ভাগ্য কি জানি কোন পথ তাকে নির্দ্দেশ করচে! মুখে বল্লে, না সাহেব তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—ফাঁকি তুমি পড়বে না।

ইয়ার হোসেন বল্লে—একটা গল্প বলি শোন তবে। একবার আমার জাহাজে ছ'সাতজন মাল্লা মদ খেয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে। তাদের দলে একজন সর্দ্দার ছিল, সে এসে আমায় জানালে, এই-এই সর্ত্তে আমি রাজি না হোলে তারা আমার হাত পা বাঁধবে—মেরেও ফেলতে পারে। আমি ওদের সান্ত্বনা দিয়ে সর্ত্তে সই করে দিলাম। তারপর ইঞ্জিন রুমের বড় কর্ম্মচারীকে ডেকে বল্লুম—জাহাজে কয়লা দিয়েই ষ্টীম্ বন্ধ করে ফার্ণেসের মুখ খুলে রাখবে।

ইঞ্জিনিয়ার বিস্মিত ভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—কেন কাপ্তেন সাহেব—এ তো বড় বিপজ্জনক ব্যাপার—সেই ভীষণ উত্তাপে ফার্ণেসের মুখ খুলে রাখবো?

সে বেচারী আমার মতলব কিছু বুঝলে না। আমি সেই বিদ্রোহী সর্দ্দারকে আর তার চারজন অনুচরকে বল্লাম ফার্ণেসে কয়লা দিতে। এদিকে ইঞ্জিন রুম টেলিগ্রাফে ইঞ্জিনিয়ারকে পুরোদমে ষ্টীম দিতে বলেই ওরা ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে পুলি

ঘুরিয়ে জাহাজ প্রায় পঁচিশ ডিগ্রি কোণ করে ষ্টারবোর্ডের দিকে কাৎ করে ফেললাম। টাল সামলাতে না পেরে ওরা হঠাৎ গিয়ে পড়লো খোলা ফার্ণেসের মুখে। লোক ঠিক করা ছিল—তক্ষুণি তারা ওদের ফার্ণেসের আগুনে ধাক্কা মেরে ঠেলে দিয়ে ফার্ণেসের দরজা ঘটাং করে বন্ধ করে দিলে।

সনৎ ও সুশীল রুদ্ধ নিশ্বাসে বললে—তারপর?

—তারপর? তারপর দুদিন পরে কতকগুলো আধপোড়া হাড়, পোড়া কয়লার ছাইয়ের সঙ্গে ফার্ণেস-সাফ-করা কুলী সমুদ্রের জলে ফেলে দিলে। মিউটিনির শেষ হয়ে গেল।

—কেউ টের পেলে না?

—সবগুলো বদমাইস যখন ও পথে গেল—তখন বাকি-গুলো আপনা আপনিই চুপ করে গেল। ভাল মানুষির দিন চলে গিয়েচে জানবেন। নিষ্ঠুর হতে হবে, নির্ম্মম হতে হবে—তবে মানুষের অন্যায়ের প্রতিশোধ দিতে পারবেন।

সুশীল বুঝলে না এমন নিরীহ ভালমানুষটির আড়ালে কি করে এমন বজ্রসম দৃঢ় ও নির্ম্মম চরিত্র লুকানো থাকতে পারে।

—আর একটা কথা—অস্ত্রশস্ত্র কেমন আছে আপনাদের?

—কিছু না, একটী করে অটোম্যাটিক আছে দুজনের—তার কার্টি্জ নেই।

—রাইফেল নেই?

—ভারতে থেকে রাইফেল কেনা? মিঃ হোসেন, এবার আপনি হাসালেন।

ইয়ার হোসেন দ্বিরুক্তি না করে বেরিয়ে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে একটা বড় রিভলভার নিয়ে এসে সুশীলের হাতে দিয়ে বললে—পছন্দ হয়?

—ওঃ, এতো চমৎকার জিনিষ!

এই কিনবো তিনটি তিনজনের আর একটা পুরোনো মেসিনগান—

—মেসিনগান কি হবে?

—অনেক দরকার আছে।

মিঃ ইয়ার হোসেন লোকটা নিতান্ত খালাসী শ্রেণীর নয়। সুশীল ও সনৎ দুজনেই দেখলে সে অনেক রকম জানে শোনে। জাহাজ চালানোর যন্ত্রাদি কিনবার সময় তার কিছু কিছু বিজ্ঞানের জ্ঞানও আছে—এ পরিচয় পাওয়া গেল। চালচলন, ধরণধারণে—সে সর্ব্বদাই মনে করিয়ে দেয় যে, সে সাধারণ নয়।

সুশীল জামাতুল্লাকে বল্লে—তুমি বলেছিলে দুশো টাকা হলেই হবে—এতো এখন দেখচি পাঁশো টাকাই মিঃ হোসেন নিয়ে নিলে নানা ছুতো করে—হাতে কিন্তু এক পয়সাও রইল না—

—কোনো ভয় নেই বাবুজি, আমি যখন আছি। ও তেমন লোক নয়।

—লোক নয় কি রকম? ও ভয়ানক লোক, আমরা

বুঝেচি। ও দরকার মনে করলে তোমার মত পুরোণো বন্ধুর গলা কাটতে এতটুকু দ্বিধা কর্‌বে না।

—বাবুজি, দেখচি ভয় পেয়ে গিয়েছেন।

—তা একটু পেতে হয়েচে! টাকাটা ও মেরে দেবে না তো? তুমি হুঁসিয়ার হয়ে থাকবে ওর পেছনে পেছনে।

—বাবুজি আমি হাজার পেছনে থেকেও কিছু করতে পারবো না—ও যদি ইচ্ছে করে তবে সিঙ্গাপুর থেকে আজই পালিয়ে যেতে পারে—কেউ পাত্তাই পাবে না—ইয়ার হোসেন ছাঁচটার কথা জিগ্যেস্ করছিল—

—তুমি কি বললে?

—বললুম, বাবুর কাছে আছে।

—মতলব কি?

—না বাবু, খারাপ কিছু নয়—ও একবার দেখতে চায়।

—ওঃ, ভাগ্যিস্ আসল পদ্মরাগ খানা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এসেছিলাম কলকাতায়! নইলে সেই পাথর নিয়ে কলকাতাতেই খুন হয়ে গেল মেটেবুরুজে। এখানে আনলে সে পাথর আমরা হাতে রাখতে পারতাম না।

জামাতুল্লা গলার স্বর নীচু করে বল্লে—বাবুজি এখানেও লোক পেছন নিয়েছে।

সুশীল ও সনৎ একযোগে সবিস্ময়ে বলে উঠলো—কি রকম!

—এখন বোলবো না, আপনারা ভয় পেয়ে যাবেন।

সিঙ্গাপুর ভয়ানক জায়গা—এখানে দিন দুপুরে মানুষের বুকে ছুরি বসায়—পরে শুনবেন। সিঙ্গাপুরে যেদিকে বড় ডক্ তৈরী হয়েচে, ওর কাছে অনেকদূর পর্য্যন্ত সামরিক ঘাঁটি। সাধারণ লোককে সে সব রাস্তা দিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। জামাতুল্লাকে পথ প্রদর্শকরূপে নিয়ে দুজনে সেই দিকে বেড়াতে বেরুলো। সমুদ্রের নীল দিগন্ত প্রসারী রূপ এখান থেকে যেমন দেখায়, এমন আর কোথা থেকে নয়। দুপুরের কাছাকাছি সময়টা, প্রখর রৌদ্র কিরণের সমুদ্র জল, ইস্পাতের ছবির মত ঝক্‌ঝক্ করচে। দুখানা মানোয়ারী জাহাজ বন্দর থেকে দূরে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে।

একজন চীনেম্যান এসে ওদের পিজিন ইংলিশে বল্লে—টি, স্যার, টি?

—নো টি।

—নো টি স্যর? মাই হাউস্ হিয়ায় স্যর, ভেরি গুড্ হোম-মেড্ টি স্যর?

সনৎ বল্লে—চলো দাদা, চলো জামাতুল্লা—একটু চা খেয়ে আসি।

সবাই মিলে রাস্তা থেকে একটু দূরে একটা চীনা বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে একটা এ্যাসবেষ্টাস্এর ঢেউ খেলানো পাত দিয়ে ছাওয়া ছোট্ট বাড়ীতে এলো। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাঁশের টেবিল পাতা আছে বারান্দায়। তিনজনে সেখানে বসে দূর সমুদ্রের দৃশ্য দেখচে—এমন সময় চীনেম্যানটা চা

নিয়ে এল। ওরা চা খাচ্ছে, সে লোকটা আবার কিছু কেক্ নিয়ে এসে ওদের সামনে রাখলে। ওদের বল্লে—তোমরা কোথায় যাবে?

সুশীল বল্লে—বেড়াতে এসেচি।

—কোথা থেকে?

—কলকাতা থেকে?

—ভেরি গুড্। চমৎকার জায়গা সিঙ্গাপুর।—এখান থেকে আর কোথাও যাবে নাকি?

—না, আর কোথাও যাবো না।

—ভাল কিউরিও কিনবে?

—কি জিনিস?

—এসো না ঘরের মধ্যে?

ওরা তিনজনে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। বুদ্ধের মূর্ত্তি, মালা, ড্রাগনের মূর্ত্তি, পোরসিলেনের পেটমোটা চীনে ম্যাণ্ডারিনের মূর্ত্তি ইত্যাদি সাধারণ সৌখিন জিনিস একটা আলমারিতে সাজানো—ওরা হাতে করে দেখচে, এমন সময়ে সনৎ একটা কি জিনিস হাতে নিয়ে অস্ফুট স্বরে প্রায় চীৎকার করে উঠলো।

—দাদা দেখো?

সুশীল ও জামাতুল্লা তুজনেই চেয়ে দেখলে, একখানা জেড্ পাথরের তৈরী ছুরির গায়ে কি আঁক জোঁক কাটা। ভাল করে তুজনেই দেখলে অবিকল সেই আঁক জোঁক, নটরাজনের পদ্মরাগ মনির গায়ে যে আঁক ছিলো।

ওরা সবাই অবাক হয়ে গেল।

সুশীল বল্লে—এ ছুরিখানার দাম কত?

—দু ডলার, মিষ্টার।

—এ ছুরি তুমি কোথায় পেলে?

—দেখি ছুরিখানা? ও, এ আমি একজন মালয়ের কাছে কিনেছিলাম।

—এখানেই?

—হাঁ, একজন মাল্লা ছিল সে।

—কোথা থেকে সে এ ছুরিখানা পেয়েছিল তা কিছু বলেনি?

—না মিষ্টার। তবে এ ছুরিখানা সে ভয়ে পড়ে বিক্রী করে? সে বলেছিল দু দুবার সে প্রাণে মরতে মরতে বেঁচে যায়, এ ছুরিখানার জন্যে। তার পেছনে লোক লেগেছিল। লুকিয়ে আমার কাছে বিক্রী করে। কেউ জানে না যে এখানা আমার কাছে আছে।

—আমরা এখানা নেবো।

—ওখানা বিক্রী হবেনা।

—আমরা তিন ডলার দেবো।

—নিয়ে বিপদে পড়বে তোমরা। ও নিও না।

—তোমার দোকানের জিনিস বিক্রি করতে আপত্তি কি?

—আমি আমার খরিদদারদের বিপদে ফেলতে চাইনে। শোনো মিষ্টার, আমি জানি ও ছুরি তুমি কেন নিতে চাইচ।

ওই আঁক জোঁকগুলোর জন্যে—ঠিক কি না? প্রাচীন কাল থেকে এ দেশে অনেকে জানে ওই আঁকগুলো কোথাকার এক গুপ্ত নগর আর তার ধন ভাণ্ডারের হদিস্। সকলে জানে না বটে, তবে পুরোনো লোক কেউ কেউ জানে। অনেক পুরোনো জেড্ পাথরের আংটিতে ওই আঁক জোঁক আমি দেখেচি। ও নিয়ে একটা গুপ্ত সম্প্রদায় আছে। সম্প্রদায়ের বাইরে আর কারো কাছে এই আঁক জোঁক ওয়ালা আংটি কি ছুরি কি কবচ দেখলে তারা তার পেছনে লেগে গুপ্তহত্যা পর্য্যন্ত করে ফেলে—তবে তাদের আসল উদ্দেশ্য থাকে, জিনিসটাকে হস্তগত করা।

—কেন?

—পাছে অন্য কেউ ওই আঁক জোঁকের হদিস্ পেয়ে সেই প্রাচীন নগর আর তার গুপ্ত ধনভাণ্ডার আবিষ্কার করে ফেলে? ওরা নিজে যখন বের করতে পারলে না—তখন আর কাউকে ওরা খোঁজ করতেও দেবে না। ও চিহ্নের জিনিস কাছে রাখা মানে প্রাণ হাতে করে বেড়ানো। কিন্তু আমার মনে হয় কি জানো, মাষ্টার?

—কি?

—ওরকম নগর কোথাও নেই। ও একটা মিথ্যে প্রবাদের মত এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। কেউ দেখেচে এ পর্য্যন্ত বলতে পারো? কেউ বলতে পারে সে দেখেচে? কেউ সন্ধান দিতে পারে? ও একটা ভূয়ো গল্প।

চা খেয়ে বাইরে এসে তিনজনে সমুদ্রের দিকে চললো।

চীনেম্যানটী পেছন থেকে ডেকে বল্লে—ওদিকে যেওনা মিষ্টার, সামরিক সীমানা—যাওয়া নিষেধ। সমুদ্রের ধারে এদিকে বসবার জায়গা নেই।

একটা একটু নির্জ্জনস্থানে গিয়ে সুশীল বল্লে—জামাতুল্লা, শুনলে সব কথা? এখনো কি তোমার মনে হয় সে নগর আছে কোথাও? আমরা আলেয়ার পেছনে ছুটচি নে? নটরাজনের গল্প ভূয়ো নয়?

জামাতুল্লা বল্লে—তবে পদ্মরাগমণি এল কোথা থেকে?

—আমি তোমায় বলচি নটরাজনের কাহিনী আগাগোড়া বানানো গল্প। পদ্মরাগ মণিখানা সে কোনো প্রকার অসৎ উপায়ে হস্তগত করে—যার ওপরে প্রাচীন ও প্রচলিত প্রথানুযায়ী ঐ চিহ্নটী আঁকা ছিল। এ ছাড়া ওর কোনো মানে নেই।

জামাতুল্লার মুখচোখের ভাব হঠাৎ যেন বদলে গেল—কত বৎসর পূর্ব্বের এক স্বপ্নভরা দিন, এক আতঙ্কভরা কৃষ্ণা রজনীর স্মৃতি তার মুখের রেখায়, চোখের দৃষ্টিতে। সে বল্লে—কিন্তু বাবুজি, নটরাজন হয়তো দেখেনি, আমি তা দেখেচি। ভীষণ বনের মধ্যে অন্ধকার রাত কাটিয়েচি। আমি কারো কথা শুনিনে।

—খুব সাবধান জামাতুল্লা। আমাদের প্রাণের দাম এক কাণা কড়িও না, যদি একথা কোনো রকমে প্রকাশ হয়, যে,

আমরা ওই আঁকজোঁক পাড়া পাথরের ছাঁচ বা সেই নগর খুঁজতে বেরিয়েচি।

—ঠিক বাবুজি। সে কথা আমারও মনে হয়েচে। এই সিঙ্গাপুর ভয়ানক জায়গা—এখানে পথে পথে রাত্রের অন্ধকারে খুন হয়। ভারি সাবধানে থাকতে হবে আমাদের। ইয়ার হোসেনকে সাবধান করে দিতে হবে। মুস্কিল হয়েচে লোকটা মাতাল, মদ খেয়ে কোনো কথা প্রকাশ করে না ফেলে। চলো, যাওয়া যাক।

তিনজনে সতর্কদৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে দেখতে দেখতে বাসার দিকে রওনা হোল।

পরদিন ইয়ার হোসেন এসে ওদের বাসায় খুব সকালেই উপস্থিত হোল। সনৎ তখন উঠেছিল। চায়ের জন্যে ষ্টোভ ধরিয়েচে—ইয়ার হোসেনকে দেখে বল্লে—আসুন, মিঃ হোসেন ঠিক সময়েই এসেছেন—চা তৈরী।

হোসেন রুক্ষ প্রকৃতির লোক। বলে উঠলো—চা খাবার জন্যে ঠিক আসিনি। আরও দুশো টাকা চাই।

হঠাৎ সনতের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—আরও দুশো! তাহোলে তো আমাদের হাতে রইলনা কিছু।

—তা আমি কি জানি? এ কাজে এসেছেন যখন, তখন পয়সার জন্যে হঠলে চলবে না। নয়তো বলুন ছেড়ে দিই।

—না না, দাঁড়ান আমি দাদা ও জামাতুল্লাকে ডাকি।

সুশীল শুনে বল্লে—তাইতো ব্যাপার কি? চলো, দেখি ব্যাপার কি।

ইয়ার হোসেন বাইরে বসে আছে। সুশীল গিয়ে বল্লে—গুড্ মর্নিং মিঃ হোসেন। কি মনে করে এত সকালে?

—সব ঠিক। আজ রাত্রে রওনা হতে হবে। সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গিয়েচে।

সনৎ ও সুশীল একসঙ্গে বলে উঠলো—কি রকম?

ইয়ার হোসেন গম্ভীর মুখে বল্লে—সব ঠিক। তার আগে সেই ছাঁচখানা একবার দেখি—এখুনি। আর দুশো টাকা—এখুনি।

সুশীলের ইঙ্গিতে সনৎ বাক্স খুলে প্যারিস-প্লাষ্টারের ছাঁচ ওর হাতে দিলে। ইয়ার হোসেন ছাঁচখানা উল্টে পাল্টে দেখে-শুনে বল্লে—নাও। এ-সব বুজরুকী—অন্য কিছুই না। কিছুই হবে না হয়তো। টাকা?

সুশীল বল্লে—টাকা রয়েচে জামাতুল্লার কাছে। সে আসুক।

—কোথায় সে?

—তা তো জানি নে। সকালে বেড়াতে বেরিয়েচে।

—আচ্ছা, আমি বসি।

—এখন কি ঠিক কোরলেন বলুন মিঃ হোসেন?

—এখান থেকে ডাচ্ ষ্টীমার 'বেন্দা' ছাড়ছে আজ রাত দশটায়। আমাদের নামতে হবে সাণ্ডাপান বন্দরে—সুলু

সমুদ্রের ধারে। সাগুাপান মশলার বড় আড়ত—সেখান-থেকে চীনে জাঙ্ক্ ভাড়া করে যাবো।

—এসব অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ডাচ্ ষ্টীমারে উঠতে দেবে? মেসিন গান কিনেচেন নাকি?

—সব ঠিক আছে। আপনি শুধূ দেখুন ইয়ার হোসেন কি করতে পারে?

আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। জামাতুল্লা আর ফেরে না। সুশীল ও সনৎ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লো। কাল বিকেলের সেই চীনাম্যানের কথা বার বার মনে পড়ছিল ওদের। কথাটা ইয়ার হোসেনকে বলা ঠিক হবে না হয়তো—ভেবেই ওরা বল্লে না। কিন্তু জামাতুল্লা সব জেনেশুনে একা বেরুলো কোথায়?

বেলা প্রায় দশটা। এমন সময় জামাতুল্লা ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে এসে হাজির হোল। ওর মুখের চেহারা দেখে তিন জনেই একসঙ্গে বল্লে—কি হোল তোমার?

জামাতুল্লা ক্ষীণ হাসি হেসে বল্লে—কিছুই না।

—কিন্তু তোমার চেহারা দেখে—

—এই রোদে—

সুশীল বল্লে—জামাতুল্লা, মিঃ হোসেন আরও দুশো টাকা চান।

—ও! তা দিন বাবু। এই নিন্ চাবি।

—উনি বলচেন আজ রাত্রে আমাদের রওনা হতে হবে।

জামাতুল্লা সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বল্লে—টাকাটা দিয়ে দিন ওঁকে আগে।

টাকা নিয়ে ইয়ার হোসেন বিদায় নেবার পর-মুহূর্ত্তেই সুশীল নিম্ন-সুরে বল্লে,—কি হয়েছিল তোমার? দেরী করলে কেন?

জামাতুল্লা চারিদিকে চেয়ে বল্লে—বড় বেঁচে গিয়েচি। ডকের পাশে যে গলি আছে ওখানে দুজন মালয় গুণ্ডা আমাকে আক্রমণ করেছিল। দুজন দুদিক থেকে কিরীচ হাতে। ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিতো আর একটু হোলে। আমি প্রাণপণে ছুটে বেঁচেছি। তোমরা অত ছুটতে পারতে না, মারা পড়তে ওদের হাতে। কাল সেই চীনেম্যানের কথাই ঠিক। আমরা খুব বিপন্ন এখানে। বাড়ী থেকে কোথাও বেরিও না। ইয়ার হোসেনকে কিছু বোলো না।

সনৎ ও সুশীল রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে ওর কথা শুনছিল। কথা শেষ হোলে সনৎ তাকে চা ও টোষ্ট খেতে দিয়ে বল্লে—কিছু বলিনি আমরা। ও আজই যেতে বলচে—শুনেচ তো?

—যাতে হয় আজই আমাদের পালাতে হবে। এখন প্রাণ নিয়ে জাহাজে উঠতে পারলে বাঁচি।

—বলো কি জামাতুল্লা? এত ভয় নেই। চীনেম্যানটার বাজে গল্পটা দেখচি তোমার মনে বড় দাগ কেটে দিয়েচে।

—বাবুজি, মেটেবুরুজের মাঠে খুনের কথা ভেবে দেখুন। সে পাথরখানার জন্যে নয়—আঁক-জোঁকের জন্যে। এখন

আমার তাই মনে হচ্ছে। অসাবধান হবেন না আজ দিন-মানটা। জাহাজে উঠলে কতকটা বিপদ কাটে বটে।

সেদিন বিকেলে ইয়ার হোসেনের লোক আবার এল। একটা সীল-মোহর করা চিঠি সুশীলের হাতে দিয়ে বল্লে—এর উত্তর এখুনি চাই। সুশীল চিঠিখানা পড়ে দেখলে, আজ কিভাবে কোথা থেকে রওনা হতে হবে, সেই ব্যবস্থা চিঠিতে লেখা। ইয়ার হোসেন অন্য পথ দিয়ে যাবে। ওদের যেন সে চেনে না এভাবে। জাহাজে না উঠে এদের তিনজনের সঙ্গে সে কথাবার্ত্তা বলবে না।

সুশীল চিঠির উত্তর দিয়ে দিলে। জামাতুল্লা বল্লে—আমাদের জিনিষপত্র যদি কিছু কিনতে হয়—এই সময় কিনে নিয়ে আসি—চলুন।

ওরা বেরিয়ে এল বাসা থেকে। ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীটের বড় বাজারে জিনিষপত্র কিনবে এই ওদের ইচ্ছা। জামাতুল্লা বল্লে—বাবু, কিছু ভাল জিনিষ খেয়ে নেওয়া যাক। জানেন, কোনো অজানা রাস্তায় অনেকদূর যেতে হোলে, ভাল খেয়ে নিতে হয়। অনেকদিন হয়তো ভাল খাবার অদৃষ্টে জুটবে না।

একটা শিখ রেষ্টুরেণ্টে ওরা গিয়ে বসলো। মাংস, কাট-লেট, চা টোষ্ট ইত্যাদি আনিয়ে খাওয়া সুরু করেচে, এমন সময় একজন ইউরোপীয়-পোষাক-পরা মালয় এসে ওদের টেবিলে বসে বিনীতভাবে বল্লে,—সে কি তাদের সঙ্গে বসে খেতে পারে?

সুশীল বল্লে—হাঁ, নিশ্চয়।

সে আর কোনো কথা না বলে খাবার আনিয়ে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বসে খেতে লাগলো তারপর আবার ওদের দিকে চেয়ে বল্লে,—আপনারা ভারতীয়? সুশীল ভদ্র ভাবে উত্তর দিলে—হ্যাঁ।

—এখানে এসেচেন বেড়াতে না?

—হ্যাঁ।

—কেমন লাগচে সিঙ্গাপুর?

—বেশ জায়গা।

—এখান থেকে দেশে ফিরচেন বোধ হয়?

—তাই ইচ্ছে আছে।

—আপনারা তিন জনে বুঝি এসেচেন?

—না, আমরা এখানে এক হোটেলে থাকি—আলাপ হয়ে গিয়েচে।

—বেশ, বেশ।

—আপনারা কোন হোটেলে উঠেছেন জানতে পারি কি? আমাদের একজন ভারতীয় বন্ধুর একটা ভাল হোটেল আছে, সেখানে খাবার-পত্র বেশ সস্তা। ঘরদোরও ভাল। যদি আপনাদের দরকার হয়—

সনৎ হঠাৎ বলে উঠলো—না, ধন্যবাদ। আমরা আজই চলে যাচ্চি।

সুশীল টেবিলের তলা দিয়ে সনৎকে এক রামচিম্‌টি

কাটলে। মালয় লোকটার চোখে-মুখে একটা কৌতূহলের ভাব জাগলো। সেটা গোপন করে সে বল্লে—ও! আজই যাবেন? কিন্তু ভারতের জাহাজ তো আজ ছাড়বে না?

সুশীল বল্লে—না, আমরা রেলে উঠে যাচ্চি কুয়ালা লামপুর।

—ও, কুয়ালা লামপুর? দেখে আসুন, বেশ সহর।

আরও কিছুক্ষণ পরে লোকটা বিল চুকিয়ে দিয়ে চলে গেল। সুশীল রাগের সঙ্গে সনতের দিকে চেয়ে বল্লে—ছি, ছি, এত নির্ব্বোধ তুমি? ও-কথা কেন বলতে গেলে?

সনৎ অপ্রতিভ মুখে বল্লে—আমি ভাবলাম ওতেই আপদ বিদেয় হয়ে যাবে। অত জিজ্ঞেস করার ওর দরকার কি? আমরা যদি বা যাই, তোর তা কি রে বাপু?

—তা নয়। কে কি মতলব নিয়ে কথা বলে, দরকার কি ওদের সঙ্গে সব কথা বলার?

জামাতুল্লা বল্লে—ঠিক কথা বলেচেন বাবুজি।

সন্ধ্যার কিছু আগে ওরা রেষ্টুরেণ্ট থেকে বার হয়ে রাস্তায় নেমে দু-একটা জিনিস কেনবার জন্যে বাজারের দিকে চলেচে—এমন সময় জামাতুল্লা নীচু গলায় চুপি চুপি বল্লে—ওই দেখুন, সেই লোকটা!

সুশীল ও সনৎ চেয়ে দেখলে সেই মালয় লোকটা একটা দোকানে কি একটা জিনিস কিনচে। ওদের দিকে পিছন ফিরে।

সুশীল বল্লে—চল আমরা এখান থেকে চলে যাই—মোড়ের দোকানে জিনিস কিনি গে।

জিনিস কিনতে একটু রাত হয়ে গেল। ওরা বড় রাস্তা বেয়ে অনেকটা এসে ওদের হোটেল যে গলিটার মধ্যে, সে গলিটাতে ঢুকতে যাবে এমন সময় কি একটা ভারি জিনিস সুশীলের ঠিক বাঁ হাতের দেয়ালে জোরে এসে লেগে ঠিকরে পড়লো সামনে রাস্তার ওপরে। ওরা চমকে উঠলো! জামাতুল্লা পথের ওপর থেকে জিনিসটা কুড়িয়ে নিয়ে বল্লে—সর্ব্বনাশ!

ওরা দুজনে নীচু হয়ে জিনিষটা দেখতে গেল—কিন্তু জামাতুল্লা বল্লে—বাবুজি, ছুটে আসুন, এখানে আর দাঁড়াবেন না—বলচি!

দুজনে জামাতুল্লার পিছনে দ্রুতপদে চলতে চলতে বল্লে—কি, কি হয়েচে? কি জিনিস ওটা?

মিনিট পাঁচ ছয় ছুটবার পরে নির্জ্জন গলিটার শেষ প্রান্তে ওদের হোটেলটা দেখা গেল। জামাতুল্লা হাই ছেড়ে বল্লে—যাক্, খুব বাঁচা বেঁচে যাওয়া গিয়েচে। এখানা মালয় দেশের ছুঁড়ে-মারা ছুরি। ওরা দশ বিশ গজ তফাৎ থেকে এই ছুরি ছুঁড়ে লোকের গলা দুখানা করে কেটে দিতে পারে। আমাদের তাগ্ করেই ছুরিখানা ছুঁড়েছিল—কিন্তু অন্ধকারে ঠিক লাগেনি। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে যে ছুঁড়েচে, তার আর-একখানা ছুরি ছুঁড়তেই বা কতক্ষণ?

সনৎ সেই ভারি ছোরাখানা হাতে করে বল্লে—ওঃ, এ গলায় লাগলে পাঁঠা কাটার মত মুণ্ডু কেটে ছট্‌কে পড়তো। কানের পাশ দিয়ে তীর গিয়েচে!

সুশীল বল্লে—এ সেই গুপ্ত সম্প্রদায়ের লোকের কাজ। আমাদের পেছনে লোক লেগেচে।

জামাতুল্লা বল্লে—লোক লেগেচে, তবে আমাদের বাসাটা এখনও বার করতে পারেনি। আমি বলিনি যে এখানে আমরা বিপন্ন। আমার না বলবার কারণ আছে।

রাতে ডাচ্ ষ্টিমার 'বেন্দা' ছাড়লো। ইয়ার হোসেন বড় বড় কেরোসিন কাঠের প্যাক বাক্স ওঠালে গোটাকতক জাহাজে—তাদের বাইরে বিলিতি বিয়ার মদের বিজ্ঞাপন মারা। ওঠবার সময় অবিশ্যি কোনো হাঙ্গামা হোল না—কিন্তু সুশীল ও সনতের ভয় তাতে একেবারে দূর হয় নি। সিঙ্গাপুরের বন্দর ও প্রকাণ্ড নৌ-ঘাঁটি ধীরে ধীরে দিকচক্রবালে মিলিয়ে গেল—অকূল জলরাশি আলোকোৎক্ষেপী ঢেউয়ে ঢেউয়ে রহস্যময় হয়ে উঠেচে।

চারদিনের দিন সকালে জাহাজ এসে সাঙাপান পৌঁছলো। এখানে এসে ওরা নেমে একটা চীনা হোটেলে আশ্রয় নিলে।

সাঙাপান মসলার খুব বড় আড়ত, কতলুংগা নদী এসে সমুদ্রে পড়চে, নদীর সেই মোহানাতেই বন্দর অবস্থিত—যেমন আমাদের দেশের চট্টগ্রাম।

ইয়ার হোসেন বাংলা জানে না, উর্দ্দু বা হিন্দুস্থানী ও ভুলে গিয়েচে—ও জামাতুল্লার সঙ্গে কথা বলে—পিজিন ইংলিশে ও মালয় ভাষায়। বল্লে—জামাতুল্লা, এবার তুমি তোমার সেই দ্বীপে নিয়ে যেতে পারবে তো ?

—পারবো বলে মনে হচ্চে। তবে এখনও ঠিক জানিনে—

সুশীল বল্লে—শুনুন মিঃ হোসেন, যখন আমার সঙ্গে জামাতুল্লার দেখা হয় গ্রামে, ও বলেছিল—ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজের একটা দ্বীপে ওর জাহাজ নারকেলের ছোবড়া ও কুচি বোঝাই করতে গিয়ে ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে যায়। কেমন, তাই তো জামাতুল্লা ? রাস্তার কথাটা একবার ভাল করে ঝালিয়ে নেওয়া দরকার।

—ঠিক বাবুজি—

—তারপর বলে যাও—

—তারপর আমরা সাতদিন সেইখানে থাকি।

ইয়ার হোসেন বল্লে—সেখানে থাকি মানে কি বুঝিয়ে বল। দ্বীপে না সমুদ্রে ?

—না সাহেব, দ্বীপ তো নয়—আমরা যাচ্ছিলাম এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপে। মাঝ দরিয়ায় এ কাণ্ড ঘটে। তার-পর সৌরাবায়া থেকে জাহাজ এসে আমাদের উদ্ধার করে।

—কতদিন পরে উদ্ধার করে ?

—আট দশ দিন কি ওই রকম !

সুশীল বল্লে—আগে বলেছিলে সাতদিন।

—বাবু, ঠিক মনে নেই। অনেক দিনের কথা। সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে। সেই সময় সমুদ্রের বিষাক্ত কাঁকড়া খেয়ে সব কলেরা হয়ে মারা গেল—বাকি ছিলাম কাপ্তান আর আমি। ওই সাত থেকে দশ দিনের ফাঁকে সেই দ্বীপে যাই আমি। দ্বীপ ছিল নিকটেই—যেখানে ডুবো পাহাড়ে আমাদের জাহাজ ধাক্কা খেয়েছিল, সেখান থেকে ডাঙা নজরে পড়ে। জাহাজী রসির দু রসি কি তিন রসি তফাতে। দ্বীপ দেখলে আমি চিনতে পারবো—তার ধারে একটা পাহাড়, পাহাড়ের গা বেয়ে একটা ঝর্ণা পড়চে সমুদ্রে! বড় বড় পাথর পড়ে আছে, পাথরগুলো সাদা রংএর।

সুশীল হেসে বল্লে—তোমার সেই বিষ্কমুনির দ্বীপ?

জামাতুল্লা গম্ভীর মুখে বল্লে—হাসবেন না বাবুজি। এসব কাজে নেমে এই দেশের সব দেবতাকে মানতে হবে। না মানলে বিপদ হতে কতক্ষণ? আমি খুব ভাল করেই তা জানি।

ইয়ার হোসেন বল্লে—বুঝলাম, ও সব এখন রাখো। সাঙাপান থেকে কোন্ দিকে যেতে হবে, কতদূরে? একটা আন্দাজ দাও—একটা নটিক্যাল চার্ট করে নেওয়া যাক।

—আমরা সাঙাপান থেকেই রওয়ানা হয়ে পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে—আন্দাজ যাই দুশো মাইল—সেখান থেকে পূর্ব্বে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে যাই আন্দাজ পঞ্চাশ মাইল। এইখানে সেই ডুবো পাহাড়ের জায়গাটা—যতদূর আমার মনে হচ্চে—

ইয়ার হোসেন অসহিষ্ণুভাবে বল্লে—যতদূর মনে হোলে তো হবে না? আমাদের সেদিকে যেতে হবে যে। স্লু সমুদ্রের সর্ব্বত্র তো ঘুরে বেড়াতে পারা যাবে না? আচ্ছা তুমি সে দ্বীপ কতদূর থেকে চিনতে পারবে? নেমে না, জাহাজে বসে?

—জাহাজে বসে চিনতে পারবো ওই সাদা পাথরের পাহাড় আর ঝর্ণা দেখে।

—কত সাদা পাথরের পাহাড় থাকে—

—না সাহেব, তা নেই। সে পাথরের পাহাড়ের গড়ন অন্য রকম। দেখলেই চিনবো।

ইয়ার হোসেন আর সুশীল দুজনে মিলে মোটামুটি ম্যাপ এঁকে নিয়ে সেদিন রাত্রে আর একবার মিলিয়ে নিলে জামাতুল্লার বর্ণনার সঙ্গে। চীনা জাঙ্ক্ ভাড়া করা হোল। দু' মাসের মত চাল, আটা, চা, চিনি বোঝাই করে নেওয়া হোল জাঙ্কে—আর রইল বিয়ারের কাঠের বাক্সভর্ত্তি অস্ত্রশস্ত্র ও ও মেসিন গান।

ইয়ার হোসেন প্রস্তাব করলে, এখানে বিলম্ব করা উচিত নয়। আজ রাত্রেই যাওয়া যাক্—শত্রু লাগতে পারে—

জামাতুল্লা বল্লে—সে কথা ঠিক। কিন্তু রাত্রে হারবার মাষ্টার জাহাজ কি নৌকো ছাড়তে দেবে না, পোর্ট পুলিশে ধরবে। এসব জায়গায় এই নিয়ম। বোম্বেটে ডাকাতের আড্ডা কি না স্লু সি? কড়া নিয়ম সব।

—তবে ?

—কাল সকালে চলুন সাহেব—

ইয়ার হোসেন দ্বিধার সঙ্গে এ প্রস্তাবে মত দিলে। সুশীলকে ডেকে বল্লে—রাতের অন্ধকারে যাওয়া ভাল ছিল। দিনের আলোয় সকলের মনে কৌতূহল জাগিয়ে যাওয়া ভাল না। যাই হোক, উপায় কি ?

সকাল আটটার পরে সাঙাপান থেকে ওদের নৌকো ছাড়লো। মাত্র দেড় টনের চীনা জ্যাঙ্ক্—সমুদ্রে মোচা খোলার মত—কিন্তু জামাতুল্লা বল্লে, জাঙ্ক্ হঠাৎ ডোবে না, এসব তুফান সঙ্কুল সমুদ্রে পাড়ি দিতে চীনা জাঙ্ক্এর মত জিনিষ নেই। জাহাজ ছেড়ে অনেকদূর এল, ক্রমে চারিধারে শুধু সমুদ্রের নীল জলরাশি।

জামাতুল্লা নাবিক ও কর্ণধার—কিন্তু যে বৃদ্ধ চীনাম্যান জাঙ্কের সারেং, সেও দেখা গেল বেশ জাহাজ চালাতে জানে। ছুদিন জাহাজ চলবার পরে জামাতুল্লার সঙ্গে চীনা সারেংএর ঝগড়া বেধে গেল।

ইয়ার হোসেন বল্লে—চেঁচামেচি কেন ? কি হয়েচে ?

চীনা সারেং বল্লে—জামাতুল্লা সাহেব জাহাজ চালাতে জানে না—কোথায় নিয়ে যাচ্চে—

জামাতুল্লা বল্লে—বিশ্বাস করবেন না ওর কথা। ও লোকটা একেবারে বাজে।

ইয়ার হোসেন ও সুশীল পরামর্শ করে জামাতুল্লার ওপরই

কিন্তু জাহাজ চালানোর ভার দিলে। একদিন সন্ধ্যার সময় দূরে ডাঙা ও আলোর সারি দেখা গেল।

চীনা সারেং ছুটে গিয়ে বল্লে—ওহে, বড় যে জাহাজ চালাচ্চ—ও ডাঙা আর আলো কোথাকার? এদিকে অত বড় ডাঙা কিসের!

জামাতুল্লা ত একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। চার্ট অনুসারে ওখানে আলো আর ডাঙা দেখবার কথা নয়। চীনা সারেং ইয়ার হোসেনকে আর সুশীলকে ডেকে বল্লে—ওকে বলতে বলুন স্যর, ও আলো আর ডাঙা কিসের?

জামাতুল্লাকে মাথা চুলকোতে দেখে চীনা সারেং বিজয়গর্ব্বে বল্লে—আমি বলে দিচ্চি স্যর—ওটা সাণ্ডা প্রণালীর মুখে পিয়েরপং বন্দরের আলো—তার মানে বুঝেছেন? আমরা আমাদের যাবার রাস্তা থেকে একশো মাইল পূব-দক্ষিণে হটে এসেছি—এই রকম করে জাহাজ চালালে দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছতে আমাদের আর বেশি দেরি থাকবে না স্যর।

চীনা সারেং সেদিন থেকে হোল কাপ্তেন।

সুশীল বল্লে—রাগ কোরোনা জামাতুল্লা তুমি অনেকদিন এ কাজ করোনি, ভুলে গিয়েচ হে।

জামাতুল্লা বল্লে—তা নয় বাবুজি। আমি ভুলিনি জাহাজ চালানো। আমার চার্ট ঠিক ছিল, আমার মনে হয় কি গোল-মাল হয়েচে বা কেউ চার্টে ভুল করে রেখেচে।

আরো তিন দিন পরে বিকেলের দিকে চীনা কাপ্তেন বল্লে—

পারা নামচে স্যর, দড়িদড়া সামলে আর জিনিস সামলে আপনারা খোলের মধ্যে নেমে যান—ঝড় উঠবে।

তিন ঘণ্টার মধ্যে ভীষণ ঝড় এল পূব-দক্ষিণ কোণ থেকে। দড়িদড়া ছিঁড়ে পাল উড়িয়ে নিয়ে যায়—জামাতুল্লা চীৎকার করে বল্লে—সব খোলের মধ্যে যান—ভয়ঙ্কর ঢেউ উঠেচে—

জাঙ্কের ডেকের ওপর বড় বড় ঢেউ সবেগে আছড়ে পড়ে ক্ষুদ্র দেড় টনের জাঙ্ক্খানা যে কোনো মূহূর্ত্তে ভেঙে চুরে সমুদ্রের তলায় ডুবিয়ে দেবে, মনে হোল সবারই—কিন্তু দু'তিন বার জাঙ্ক্খানা ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেল—নাকানি-চুবুনি খেয়েও আবার সমুদ্রের ওপর ঠেলে ওঠে। সাবাস মোচার খোলা!

হঠাৎ চীনা কাপ্তেন চীৎকার করে উঠলো—সামনে পাহাড় —সামলাও—

জামাতুল্লা হালে ছিল, ডাইনে সজোরে হাল মারতেই কান ঘেঁসে কতকগুলো বজ্‌বজে সমুদ্রের ফেনা ঘুরতে ঘুরতে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে চলে গেল, ফেনাগুলোর মাঝে মাঝে কালো রংয়ের কি একটা টানারেখা যেন ফেনরাশিকে দুভাগে চিরে দিয়েচে।

ডুবো পাহাড়!

ঝড়ের শব্দে কে কি বলে শোনা যায় না—তবুও সুশীল শুনলে, চীনা কাপ্তেন চীৎকার করে বলচে—খুব বাঁচা গিয়েচে! আর একটু হোলেই সব শেষ হোত আমাদের!

ইয়ার হোসেন ও সুশীল বাইরে একচমক দেখতে পেলে—জলের মধ্যে মরণের ফাঁদ পাতাই বটে! সাক্ষাৎ মরণের ফাঁদ।

জামাতুল্লা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে হাল ধরে আছে। একটু আলগা হোলেই এই ভীষণ জায়গায় জাঙ্ক্ বানচাল হয়ে ধাক্কা মারবে গিয়ে বাঁ দিকের ডুবো পাহাড়ে। খানিকটা পরে জামাতুল্লার চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো ভয়ে—একি! দু'দিকেই যে ডুবো পাহাড়!—ডাইনে আর বাঁয়ে!

চীনা কাপ্তেনকে হেঁকে বল্লে—কোথা দিয়ে জাহাজ চালাচ্চ গাধার বাচ্চা? পাহাড়ের চূড়ো দিয়ে যে। মারবে এবার—

ঝড়ের ও তুফানের মধ্যে চীনা কাপ্তেনের কথাগুলো অট্ট-হাস্যের মত শোনা গেল। কি যে সে বল্লে, জামাতুল্লা বুঝতে পারলো না—কিন্তু যারই ভুল হোক, জাহাজ বাঁচাতেই হবে।

সে সামনে পিছনে চেয়ে দেখলে—পাহাড়ের কালো রেখা অতিকায় শুশুকের শিরদাঁড়ার মত জলের ওপর স্পষ্ট জেগে, মাস্তুলের দিকে চেয়ে দেখলে চীনা সারেং সব পাল গুটিয়ে ফেলেচে—কেবল মাঝের বড় মাস্তুলে ষোলফুট চওড়া বড় পালখানা ঝড়ের মুখে ছিঁড়ে ফালি ফালি হয়ে অসংখ্য সাদা নিশানের মত উড়চে। সে দেখলে নিশানগুলোর জন্যে জাহাজ-খানা এদিক ওদিক হেলচে, ঘুরচে। চক্ষের নিমিষে সে কোমর থেকে ছুরি বার করে পালের মোটা শনের কাছি কাটতে লাগলো। একবার করে খানিকটা কাটে, আবার ছুটে গিয়ে হাল টিপে ধরে।

অমানুষিক সাহস ও দৃঢ়তা এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পাঁচ ছ' মিনিটের মধ্যে সে অত বড় মোটা রসিটা কেটে ফেললে।

ফেলতেই দড়িদড়া ঢিলে পড়ে পাল সড়াৎ করে অনেকখানি নেমে এল।

চীনা কাপ্তেন চীৎকার করে বল্লে—কে রসি কাটলে?

—আমি।

—খুব ভাল কাজ করেছ। এবার সামলাও ঠ্যালা। যদি জানো না কোনো কিছু, তবে সব তাতেই সর্দ্দারি করতে এসো কেন?

চীনা কাপ্তেন মিথ্যে বলেনি। জামাতুল্লা সভয়ে দেখলে পাল ঢিল পড়াতে জাঙ্ক্ এবার জগদ্দল পাথরের মত ভারি হয়ে পড়েচে যেন। পিছন থেকে বাতাস ঠেলা মেরেও তাকে নড়াতে পারচে না—সুতরাং দুদিকের মরণফাঁদকে অতিক্রম করে বাহির সমুদ্রে পড়তে এর অনেক সময় লেগে যাবে—ইতিমধ্যে বাতাস দিক পরিবর্ত্তন করলেই—বিষম বিপদ।

ইয়ার হোসেন পাকা লোক। সে বুঝেছিল, কিছু একটা গোলমাল ঘটেছে। মাথা বার করে বল্লে—কি হোল আবার? জাঙ্ক্ নড়ে না যে!

চীনা সারেং বল্লে—নড়বে কি স্যর—নড়বার পথ কি আর রেখেচে জামাতুল্লা? এবার বাঁচাতে পারলাম না বোধ হয়।

কিন্তু সুখের বিষয় আধঘণ্টার মধ্যে ভয় কেটে গেল। বাতাস পিছন হতেই বয়ে চললো একটানা—এবং আধঘণ্টার মধ্যে জাঙ্ককে ডুবো পাহাড়ের ফাঁদ পার করে বাহির সমুদ্রে তাড়িয়ে দিলে।

জামাতুল্লা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

চীনা কাপ্তেন টিট্‌কিরি দিয়ে বল্লে—বাঁচলে সবাই আজ নিতান্ত বরাতের জোরে। তোমার হাতের গুণে নয়, মনে রেখো।

সমুদ্র শান্ত, জ্যোৎস্না উঠেছে—সুশীলের দল খোলের ঢাকনি খুলে ডেকের ওপর এসে দাঁড়ালো।

হঠাৎ জ্যোৎস্নার মধ্যে দূরে কি একটা বিরাট কালো জিনিষ দেখা গেল—জল থেকে উঁচু হয়ে আছে মাথা তুলে।

ইয়ার হোসেন বল্লে—কি ওটা ?

সুশীলও জিনিষটা প্রথমে দেখতে পেলে না—তারপর দেখে বিস্মিত হোল—অস্পষ্ট কুয়াসামাখা জ্যোৎস্নালোকে কিছুই ভাল দেখা যায় না—তবুও একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণকায় দৈত্যের মত আকাশের গায়ে কি ওটা জল থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ?

সনৎও সেদিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল।

একমাত্র জামাতুল্লা দুচোখ বিস্ফারিত করে জিনিসটার দিকে চেয়ে ছিল।

ইয়ার হোসেন কথার উত্তর না পেয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, জামাতুল্লা তাকে হাতের ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে ডেকের সম্মুখভাগে এগিয়ে এসে কালো জিনিসটাকে ভাল করে দেখতে লাগলো।

চীনা সারেং টিট্‌কিরি দেওয়ার সুরে বল্লে—দেখচো কি,

ওটা ডুবো পাহাড়—বুড়ো বয়সে চোখে ভাল দেখতে পাইনে—তবুও বলচি—

সুশীল বল্লে—জলের ওপর জেগে রয়েচে যে! ডুবো পাহাড় কি করে হোল?

চীনা সারেং বল্লে—ও পাহাড়ের চূড়োটা মাত্র জেগে আছে জলের ওপর, স্যর। প্রকাণ্ড ডুবো পাহাড় ওটা—

জামাতুল্লা এইবার সুশীলকে একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বল্লে—সারেং ঠিক বলচে। এতক্ষণ পরে আমি চিনেচি, এই সেই পাহাড় বাবুজি—এই পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েই—

সুশীল অবিশ্বাসের সুরে বল্লে—চিনলে কি করে?

—আমি এতক্ষণ তাই চেয়ে দেখছিলাম—এবার আমার কোনো সন্দেহ নেই—ওই ডুবো পাহাড়ের এক জায়গায় উত্তর দক্ষিণ কোণে একটা শূওরের মুখের মত ছুঁচোলো গড়ন দেখচেন কি? আসুন আমি দেখাচ্চি—এত কাল আমার মনে ছিল না, কিন্তু এবার দেখেই মনে পড়েচে।

—ইয়ার হোসেনকে বলি?

—কিন্তু ওই হলদেমুখো চীনাটাকে কিছু বলবেন না, বাবুজি। ওটাকে আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না—আপনি বলুন হোসেন সাহেবকে—

যদি ওই সেই ডুবো পাহাড়টা হয়, তবে তো ওখান থেকে জমি দেখা যাবে আর সেই সাদা পাথরের পাহাড়টা—

—সে হোল তিন রসি চার রসি তফাতে বাবুজি—চাঁদনি রাতে সাদা পাথরের পাহাড় অতদূর থেকে ভাল দেখা যাবে না। সকাল হোক—

চীনা সারেং চীৎকার করে বলে উঠলো—হাল সামলাবে না গল্প করে সময় কাটাবে—ডুবো পাহাড় সামনে সে খেয়াল আছে ?

জামাতুল্লা বিরক্ত হয়ে বল্লে—আঃ হলদেমুখো ভূতটা বড্ড জ্বালালে দেখচি—দাঁড়ান বাবুজি—আপনি হোসেন সাহেবকে বলুন, আমি দেখি ওদিকে কি বলে—

সুশীল হাসতে হাসতে বল্লে—তুমি যাই বলো, ও কিন্তু খুব পাকা জাহাজী—এ সব অঞ্চল দেখচি ওর নখদর্পণে—ওস্তাদ জাহাজী এ বিষয়ে ভুল নেই—

কিছুক্ষণ পরে চীনা সারেং তার নাবিকগিরির সুদক্ষতার এমন একটি প্রমাণ দিলে যাতে জামাতুল্লাকে পর্য্যন্ত তারিফ করতে হোলো। জামাতুল্লার হাল পরিচালনায় জাঙ্ক্ যখন ডুবো পাহাড়ের একদিক দিয়ে যাবার চেষ্টা করচে, তখন চীনা সারেং হুকুম দিলে—সামনে এগোও—পাশ কাটাবার চেষ্টা করচো কেন ?

—সামনে এগিয়ে ধাক্কা খাবো না কি ?

—এই বিদ্যে নিয়ে মাঝিগিরি করতে এসেচ সুলু সি' তে ? নিজের দেশের নদী খালে ডোঙা চালাও গে যাও গিয়ে। ওই পাহাড়ের দুপাশে ভীষণ চাপা স্রোতের মুখে পড়ে জাঙ্ক্

পাহাড়ের গায়ে সজোরে ধাক্কা মারবে—সে খেয়াল আছে? তোমার হালের সাধ্যি হবে না সে স্রোতের বেগ সামলানো—দেখচো না জল কি রকম ঘুরচে?

জামাতুল্লা তখনও ইতস্ততঃ করচে দেখে চীনা সারেং হেঁকে বল্লে—জামাতুল্লা এবার সবাইকে মারবে স্যর—ওকে বুঝিয়ে বলুন, একবার ওর হাত থেকে ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েচেন—কিন্তু এবার বোধ হয় আর রক্ষে হয় না—

সুশীল আর ইয়ার হোসেন জামাতুল্লাকে বল্লে—ও যা বলচে তাই কর না জামাতুল্লা—

—ও কি বলচে তা আপনারা খেয়াল করচেন না? ও বলচে ওই ডুবো পাহাড়ের দিকে সোজাসুজি হাল চালাতে—মরবো তো তা হোলে—

চীনা সারেং জামাতুল্লার কথা শুনতে পেয়ে বল্লে—চালিয়ে দেখোই না কি করি। মরণের অত ভয় করলে মাল্লাগিরি করা চলে না সাহেব—

জামাতুল্লা চোখ পাকিয়ে বল্লে—হুঁসিয়ার—আমি আর যাই হই—মরণের ভয় করি তা তুমি বলতে পারবে না, হল্‌দে মুখো বাঁদর—

সুশীল ধমক দিয়ে বল্লে—ও কি হচ্চে জামাতুল্লা? এ সময়ে ঝগড়া বিবাদ করে লাভ কি? সারেং যা বলচে তাই করো—

জামাতুল্লার হাতের চাকা ঘুরতেই জাঙ্ক্ পাহাড়ের একেবারে বিশ গজের মধ্যে এসে পড়লো—ঠিক একেবারে সামনা সামনি

—সবাই দুরু দুরু বক্ষে চেয়ে আছে, সামনে নিশ্চিত মৃত্যুর ঘাঁটি, এ থেকে কি করে চীনাটা জাঙ্ক্ বাঁচাবে কেউ বুঝচে না—দেখতে দেখতে বিশ গজের ব্যবধান ঘুচে হয়ে গেল দশ গজ—

আর বুঝি জাঙ্ক্ রক্ষা হয় না—মতলব কি চীনাটার?... সবাই বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে আছে—বুকের ভিতর ঢেঁকির পাড় পড়চে সবারই—হঠাৎ সারেং ক্ষিপ্রহস্তে প্রকাণ্ড একটা জাহাজী কাছি সুকৌশলে সামনের দিকে অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুঁড়ে দিয়ে বল্লে—ডাইনে হাল মারো—

সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটে গেল যা ইয়ার হোসেন ও জামাতুল্লা তাদের জাহাজী মাল্লা-জীবনের অভিজ্ঞতায় কখনো দেখেনি। জাহাজ ডান দিকে ঘুরে পাহাড়ের শুঁড়টা পেরিয়ে যেতেই সারেংয়ের কাছি গিয়ে পাহাড়ের সরু অংশটা জড়িয়ে ধরলো এবং পেছন দিক দিয়ে ঘড় ঘড় করে নোঙর পড়ার শব্দে সবাই বুঝলো বড় সি এ্যাংকর অর্থাৎ সমুদ্রের মধ্যে ফেলার উপযুক্ত বড় নোঙর তার সুদৃঢ় আঁক্‌সির মুখ দিয়ে সমুদ্রের তলার পাথর ও মাটি আঁকড়ে ধরলেই জাহাজের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হবে।

বোঁ করে অত বড় জাঙ্ক্‌খানা ডিঙি নৌকার মত ঘুরে গেল আর পরক্ষণেই স্থির, অচল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল পাহাড় থেকে তিন চার গজের মধ্যে। জাঙ্ক্ আর পাহাড়ের মধ্যে কেবল এক ফালি সরু সাগর জল, একটা বড় হাঙর তার মধ্যে কষ্টে সাঁতার দিতে পারে।

ইয়ার হোসেন বলে উঠলো—সাবাস সারেং!

সুশীল ও সনৎ নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—খুব বাঁচিয়েচে বটে—

জামাতুল্লা চুপ করে রইল।

চীনা সারেং হলদে দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বল্লে—বিদেশী লোক এখানে জাহাজ চালাতে পারে না, স্যর। জামাতুল্লা মাল্লাগিরি যা জানে, তা খাটে চাটগাঁয়ের বন্দরে—এ সব সে জায়গা নয়—এখানে জাহাজ চালাতে হোলে পেটে বিদ্যে চাই অনেকখানি—

ইয়ার হোসেন বল্লে—এখন কি করা যাবে বলো। জাহাজ তো আটকে গেল। সারেং ওদের অভয় দিয়ে বল্লে—জাঙ্ক্ আটকায় নি। জোয়ার এলেই সকালে জাঙ্ক্ ছাড়া নিরাপদ। সকলে দুরু দুরু বক্ষে সকালের প্রতীক্ষায় রইল। সুশীল আর জামাতুল্লা ভাল ঘুমুতেই পারলে না। খুব ভোরে উঠে জামাতুল্লাকে বিছানা থেকে উঠিয়ে সুশীল বল্লে—এসো, চেয়ে দেখ—চলো বাইরে—

জামাতুল্লা বাইরে এসে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বল্লে—ওই সেই সাদা পাহাড় আর সেই দ্বীপ আমি কাল রাত্রেই বুঝেছিলাম বাবুজি, কাউকে বলিনি—

—কেন?

—কি জানি বাবুজি, চীনা সারেংটাকে আর এই হোসেন সাহেবকে আমার তেমন যেন বিশ্বাস হয় না, খোদার দিব্যি বলচি ওদের সামনে মুখ খোলে না আমার। হোসেন সাহেব

আস্ত গুণ্ডালোক, বাধ্য হয়ে ওর সাহায্য নিতে হয়েচে কিন্তু সিঙ্গাপুরে ওর নাম শুনে সবাই ভয় পায়।

—সে কথা আর এখন ভেবে লাভ কি বল। ওদের নিয়েই কাজ করতে হবে যখন। ইয়ার হোসেনকে বলি কথাটা। ইয়ার হোসেন সব শুনে জামাতুল্লাকে ডেকে বল্লে—কোনো সন্দেহ নেই তোমার? এই দ্বীপ ঠিক?

—ঠিক।

—আমরা নেমে কিন্তু জাঙ্ক্ ছেড়ে দেবো—ঠিক করে দেখো এখনও।

সুশীল ও জামাতুল্লা আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—জাঙ্ক্ ছেড়ে দেবেন কেন?

—আমি ওদের অন্য এক গল্প বলেচি। আমি বলেচি জঙ্গলে মাঠের ইজারা নিয়েচি ডাচ্ গবর্ণমেণ্টের কাছে—এখানে আমরা এখন থাকবো কিছুদিন। ওদের বলতে চাইনে—চীনেরা লোক বড় ভাল না—

দুপুরের পর জালি বোটে জিনিসপত্র ও দুটী ছোট ছোট তাঁবু সমেত ওদের সকলকে অদূরবর্ত্তী দ্বীপের শিলাবৃত তীর-ভূমিতে নামিয়ে জাঙ্কের সারেং তার ভাড়া চুকিয়ে নিয়ে চলে গেল।

সুশীল ইয়ার হোসেনকে বল্লে—ডাচ্ ইষ্ট্ ইণ্ডিজের দ্বীপ তো এটা? ডাচ্ গবর্ণমেণ্টের কোনো অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল কিন্তু—

—সে সব বড় হাঙ্গামা। ডাচ্ গবর্ণমেণ্টের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে জান যাবে তাহোলে। কেন যাচ্চি আমরা ও দ্বীপে, কতদিন আমরা থাকবো—হয়তো আমাদের সঙ্গে পুলিশ পাহারা থাকতো—সব মাটি হোত। জামাতুল্লা দ্বীপের মাটিতে নেমে কেমন যেন স্বপ্নমুগ্ধের মত চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। এতকাল পরে সে যে এখানে আসবে তা মেটে-বুরুজের মাল্লাপাড়ার হোটেলে সান্‌কিতে ভাত খেতে বসে কখনও কি ভেবেছিল? সে ভেবেছিল তার দুঃসাহসের জীবন শেষ হয়ে গিয়েচে। সেই বিন্ধমুনির দ্বীপ আবার!

সুশীল ভাবছিল, কি অদ্ভুত যোগাযোগ! বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের জমিদারের ছেলে সে, চিরকাল বসেই খাবে পায়ের ওপর পা দিয়ে, নির্ব্বিঘ্নে জমিজমার খাজনা শোধ, দুপুরে লম্বা ঘুম দেবে, বিকেলে দুপুরে মাছ ধরবে, সন্ধ্যায় বৈঠকখানায় পৈতৃক তাকিয়া হেলান দিয়ে তাস দাবা খেলবে, রাত্রে পিঠে পায়েস খেয়ে আবার ঘুম দেবে—এই সনাতন জীবনযাত্রা প্রণালীর কোন ব্যতিক্রম হয়নি তার পিতৃপিতামহের বেলায়—তার বেলাতেও সে ধারা অক্ষুণ্ণই থাকতো যদি দৈবক্রমে সেদিন গড়ের মাঠে জামাতুল্লা খালাসী তার কাছে 'ম্যাচিস্' চাইতে না আসতো। কত সামান্য ঘটনা থেকে যে জীবনের কত বৃহৎ ও গুরুতর পরিবর্ত্তন সুরু হয়!

সুশীল ও সনৎ দ্বীপের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ পর্য্যন্ত তারা কোথাও দেখে নি—রীতিমত ট্রপিক্যাল অরণ্য

যাকে বলে, তা এতদিন সুশীল ছবিতেই দেখে এসেচে এবং ইংরেজি ভ্রমণের বইয়ে তার বর্ণনাই পড়ে এসেচে—এতকাল পরে তা সে দেখলো। জলের ধার থেকেই অপরিচিত গাছপালার নিবিড় বন আরম্ভ হয়েচে—বনস্পতি মাতার বড় বড় গাছের গায়ে অর্কিডের ফুলগুলি সুগন্ধে প্রভাতের বাতাস মাতিয়েচে—মোটা মোটা লতা দুলচে এগাছ থেকে ও গাছে। কত রঙের প্রজাপতি উড়চে—সামনের সুনীল সমুদ্র প্রস্তরাকীর্ণ তীরভূমিতে এসে সজোরে ধাক্কা মারচে, একেবারে ঘোলা জলরাশি থৈ থৈ করচে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত, একটা ব্রেকওয়াটার পর্য্যন্ত নেই কোথাও—যদি কেউ জলে পড়ে, তবে হাঙরের আহার্য্য হবে এ জানা কথা—এ সব সমুদ্রে হাঙরের উপদ্রব অত্যন্ত বেশি, সুশীল আগেই শুনেচে। বনের মধ্যে অনেক জায়গায় এখনও অন্ধকার কাটেনি—কারণ প্রভাতের রৌদ্র তার মধ্যে এখনও অনেক জায়গাতেই ঢোকেনি—দেখে বোধ হয়, দুপুরেও ঢোকে কিনা সন্দেহ।

ইয়ার হোসেন দেখে শুনে বল্লে—এ যে ভীষণ জঙ্গল দেখচি—

জামাতুল্লা বল্লে—আগে যেমন দেখেছিলাম তার চেয়েও যেন জঙ্গল বেশি হয়েচে।

সুশীল জানতে চাইলে এ দ্বীপে লোক আছে কিনা। ইয়ার হোসেন বল্লে—ম্যাপে তো কিছু দেয় না—এ দ্বীপের কিছুই দেখি নেম্যাপে—কি জামাতুল্লা, তুমি কি দেখেছিলে?

—কোথাও কিছু নেই।

—বেশ ভাল জানো ?

—আমার যাওয়ার পথে অন্ততঃ তো কিছু দেখিনি—

—এখান থেকে তোমার সে নগর কতদূর হবে আন্দাজ ?

—তিন চারি দিনের পথ।

—এত কেন হবে ? এ দ্বীপের প্রস্থ তো খুব বেশি হবার কথা নয়—

সুশীল বল্লে—কত বলে আন্দাজ করচেন, মিঃ হোসেন ?

—ত্রিশ মাইলের মধ্যে। তবে একটা কথা, এই জঙ্গল ঠেলে যাওয়ার পথ এগোবে না বেশি। অনেক জায়গায় পথ কেটে করে নিয়ে তবে এগুতে হবে। তিন দিন লাগা বিচিত্র নয়।

সেদিন তাঁবু খাটিয়ে দুপুরে বিশ্রাম করে বিকেলের দিকে দ্বীপের মধ্যে ঢুকবার জন্যে ইয়ার হোসেন সবাইকে তৈরি হতে বল্লে। মালয় কুলী ওরা এনেছিল সাতজন, জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে—এরা সবাই ইয়ার হোসেনের হাতের লোক এবং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। এদের গতিক বড় সুবিধে বলে মনে হয়নি সুশীলের ও সনতের, গোড়া থেকেই। দেখে মনে হয় সিঙ্গাপুরে এরা চুরি ডাকাতি ও রাহাজানি করে চালিয়ে এসেচে এতদিন। যেমন দুশমনের মত চেহারা, তেমনি ধূর্ত্ত দৃষ্টি এদের চোখের। ইয়ার হোসেনের কথায় এরা ওঠে বসে। জামাতুল্লা এদের বিশ্বাস করতো না। কিন্তু উপায় কি, ইয়ার হোসেনকে যখন দলে নিতে হয়েচে, তখন এদের রাখতে হবে।

দুদিন সমুদ্রের ধারে তাঁবু ফেলে থাকবার পরে সকলে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

সুশীল ও সনৎ এমন জঙ্গল কখনো দেখেনি। গাছপালা যে এত সবুজ, এত নিবিড়, এত অফুরন্ত হতে পারে—বাংলা দেশের ছেলে হয়েও এরা এ জিনিসটা এই প্রথম দেখলে। ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে মাঝে মাঝে এক একটা ছোট নদী বা খাড়ি —তার দুপাশে যেন গাছপালা ও বনঝোপের সবুজ পর্ব্বত— কত ধরণের অর্কিড, কত ধরণের লতা, কত অদ্ভুত ও বিচিত্র ফুল।

একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত—ঝোপ-বনের মধ্যে দিয়ে বন কাটতে কাটতে ওরা মোটে মাইল তিনেক এগিয়ে যেতে সক্ষম হোল।

সন্ধ্যার দিকে ইয়ার হোসেন বল্লে—এখানে আজ তাঁবু ফেলা যাক।

কিন্তু তাঁবু ফেলবে কোথায়? সুশীল চারিদিকে চেয়ে দেখলে ভয়ানক ঘন জঙ্গলের মধ্যে বড় বড় দোলানো লতার তলায় ভিজে স্যাঁৎসেঁতে মাটির ওপর রাত্রে বাস করতে হবে। আজ সারাদিনের অভিজ্ঞতায় এরা দেখেছে এখানকার জঙ্গলে তিনরকম জীব যেখানে সেখানে বাস করে—যে তিনটিই মানুষের শত্রু। প্রথম, বড় বড় রক্ত শোষক জোঁক, দ্বিতীয়, বিষধর সর্প, তৃতীয়, মৌমাছি। এই তিনটি শত্রুর কোনটাই

কম নয়—যে কোনটার আক্রমণ মানুষের জীবন বিপন্ন হবার পক্ষে যথেষ্ট।

কোনো রকমে তাঁবু খাটানো হোল।

ঘুমের মধ্যে কখন ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি নামলো—ট্রপিক্যাল অরণ্যের এ অঞ্চলে বৃষ্টি লেগেই আছে, এমন দিন নেই যে বৃষ্টি হয় না। ঘুমের মধ্যেই সুশীল দেখলে তাঁবুর ফাঁক দিয়ে কখন বৃষ্টির জলের ধারা গড়িয়ে এসে ওদের বিছানা ভিজিয়ে দিয়েচে। বাইরে বৃষ্টির বিরাম নেই।

হঠাৎ চারিদিক কাঁপিয়ে কোথায় এক গুরু গম্ভীর নিনাদ শোনা গেল—সমস্ত অরণ্য যেন কেঁপে উঠলো।

সনৎ চমকে উঠে বল্লে—কি ডাকে দাদা?

অন্য তাঁবু থেকে ইয়ার হোসেন বলে উঠলো—ও কিসের ডাক?

কেউ কিছু জানে না। না জামাতুল্লা, না ইয়ার হোসেন—কেবল ইয়ার হোসেনের জনৈক অনুচর বল্লে—ওটা বুনো হাতীর ডাক স্যর।

আর একজন অনুচর প্রতিবাদ করে বল্লে—ওটা গণ্ডারের ডাক।

কিছু মীমাংসা হোল না এবং আবার সেই ডাক, সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক জানোয়ারের ভীষণ গর্জ্জন, সেটা শুনে অবশ্য সকলেই বুঝতে পারলে—বাঘের গর্জ্জন।

এরই ফাঁকে আবার বন মোরগও ডেকে উঠলো। এক সময়ে এক পাল বন্য কুকুরের ডাকও।

সনৎ বল্লে—ও দাদা, এ যে ঘুমুতে দেয় না দেখছি—

সুশীল উত্তর দিলে—কানে আঙ্গুল দিয়ে থাকো—

ইয়ার হোসেন বল্লে—রাইফেল নিয়ে বসে থাকতে হবে—কেউ ঘুমিও না—

এটা নিতান্ত প্রথম দিন বলে এদের ভয় ছিল বেশি, দু' একদিনের মধ্যে জন্তু জানোয়ারের আওয়াজ গা সওয়া হয়ে গেল। নিবিড় ট্রপিক্যাল জঙ্গলের মধ্যে প্রতি রাত্রেই নানা, বন্য জানোয়ারের বিচিত্র আওয়াজ—আওয়াজ যত করে, তাঁবুর আশে পাশেই করে—কিন্তু তাঁবুর লোককে আক্রমণ করে না।

সুশীল দুদিন ঘুমুতে পারেনি—কিন্তু তিন রাত্রির পরে সে বেশ স্বচ্ছন্দে ঘুমুতে পারলে।

জঙ্গলের কুলকিনারা নেই—ওরা পাঁচদিন ধরে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরেও কোনো কিছুই দেখতে পেলে না সেখানে—ওই বন আর বন।

সূর্য্যের আলো না দেখে সুশীল তো হাঁপিয়ে উঠলো—এ জঙ্গলে সূর্য্যের আলো আদৌ পড়ে না।

আগে দেশে থাকতে সে দু একখানা ভ্রমণের বইতে পড়েছিল যে মেক্সিকোতে, মালয়ে, আফ্রিকায় এমন ধরণের বন আছে, যেখানে কখনো সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না—কথাটা আলঙ্কারিকের অত্যুক্তি হিসেবেই সে ধরে নিয়েছিল, আজ সে সত্যই

প্রত্যক্ষ করলে এমন বন, যা চির অন্ধকারে আচ্ছন্ন, পড়ন্ত বেলায় কেবল সুউচ্চ বনস্পতিরাজির শীর্ষদেশ অস্তমান সূর্য্যের রাঙা আলোয় রঞ্জিত হয় মাত্র। ক্বচিৎ নিবিড় লতাঝোপের ফাঁক দিয়ে সূর্য্যের আলো চাঁদের আলো সামান্য মাত্র পড়ে, নতুবা সকল সময়েই গোধূলি দিনমানে। চির গোধূলির জগৎ এটা যেন।

একদিন সনৎ পড়ে গেল বিপদে।

তাঁবু থেকে বার হয়ে বন্দুক হাতে শিকার করতে বার হয়ে সে একটা গাছের ডালে এক ভীষণ অজগর সাপ দেখে সেটাকে গুলি করলে। সাপটা দুলতে দুলতে গাছের ডাল থেকে পাক ছাড়িয়ে ঝুপ্ করে একবোঝা মোটা দড়াদড়ির মত নীচে পড়ে গেল।

সনৎ সেটার কাছে গিয়ে দেখলে অজগরের মাথাটা গুলির ঘায়ে একেবারে গুঁড়িয়ে গিয়েচে। কিন্তু তার লেজটা হঠাৎ এসে সনতের পা দুখানা জড়িয়ে ধরে শক্ত কাঠ হয়ে গেল। সরীস্পের হিমশীতল স্পর্শ সনতের স্নায়ুগুলোকে যেন অবশ করে দিলে, নিজের পা দুখানাকে সে আর মোটেই নাড়তে পারলে না—হাত দুটোকে যখন কষ্টে নাড়ালে তখন লোহার শেকলের মত নাগপাশের শক্ত বাঁধনে তার পদদ্বয় গতিশক্তিহীন।

অজগর তো মরে কাঠ হয়ে গেল, কিন্তু সনৎ চেষ্টা করেও কিছুতেই নাগপাশ থেকে পা ছাড়াতে পারলে না। পা যেন

ক্রমশঃ অবশ হয়ে আসছে, এমন কি সনতের মনে হোল আর কিছুক্ষণ এ অবস্থায় থাকলে সে চলৎশক্তি চিরদিনের মত হারাবে। এদিকে বিপদের ওপর বিপদ, বেলা ক্রমশঃ পড়ে আসচে—এরই মধ্যে গোধূলি গিয়ে যেন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে বনে। কিছুক্ষণ পরে দিক ঠিক করে তাঁবুতে প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব হয়ে পড়বে। আরও কিছুক্ষণ কাটলো, শেয়ালের দল বনের মধ্যে ডেকে উঠলো—একটু পরেই বন্যহস্তীর বৃংহতি অরণ্যভূমি কাঁপিয়ে তুলবে, হায়েনার অট্টহাসিতে বুকের রক্ত শুকিয়ে দেবে।

সনৎ সবই বুঝচে—কিন্তু কোনো উপায় নেই। বন্দুকটার আওয়াজ করলে তাঁবুর লোকদের তার সন্ধান দেওয়া চলতো বটে—বন্দুকের গুলি নেই। শেষ দুটো টোটা অজগরের দিকে সে ছুড়েছে।

তিমিরময়ী রাত্রি নামলো।

অসহায় অবস্থায় চুপ করে কাৎ হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া তার কোনো উপায় নেই—প্রথমটা তার মনে খুব ভয় হোল—কিন্তু মরীয়ার সাহসে সাহসী হয়ে শেষ পর্য্যন্ত সে চুপ করে শুয়েই রইল। মৃত অজগরটাকে অন্ধকারে আর দেখা যায় না—কিন্তু তার হিমশীতল আলিঙ্গন প্রতিমুহূর্ত্তে সনৎকে স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলো যে প্রাণের বদলে সে প্রাণই নিতে চায়।

সারারাত্রি এভাবে কাটলে বোধহয় সনৎ সে যাত্রা ফিরতো না—কিন্তু অনেক রাত্রে হঠাৎ সনতের তন্দ্রা গেল ছুটে।

অনেক লোক আলো নিয়ে এসে ডাকাডাকি করচে। ইয়ার হোসেনের গলা শোনা গেল—হালু-উ-উ—মিঃ রায়—

সনতের সর্ব্বশরীর ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে গিয়েছিল—সে গলা দিয়ে স্বর উচ্চারণ করতে পারলে না। কিন্তু ইয়ার হোসেনের টর্চের আলো এসে পড়লো ওর ওপরে। সবাই এসে ওকে ঘিরে দাঁড়ালো। পাশে মৃত অজগর দেখে ওরা আগে ভেবেছিল সর্পের বেষ্টনে সনতও প্রাণ হারিয়েছে—তারপর ওকে হাত নাড়তে দেখে বুঝলে ও মরেনি।

তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে সেবা শুশ্রূষা করতে সনৎ চাঙ্গা হয়ে উঠলো।

ইয়ার হোসেন সেদিন ওদের ডেকে পরামর্শ করতে বসলো।

জামাতুল্লাকে বল্লে—কই, তোমার সে মন্দিরের বা সহরের ধ্বংসাবশেষ তো দেখিনে কোনোদিকে—

জামাতুল্লা বল্লে—আমি তো আর মেপে রাখিনি মশাই ক' পা গেলে সহর পাওয়া যাবে—সবাই মিলে খুঁজে দেখতে হবে—

সুশীল একটা নক্সা দেখিয়ে বল্লে—এ ক' দিনে যতটা এসেচি, জঙ্গলের একটা খসড়া ম্যাপ তৈরি করে রেখেচি। এই দেখে আমরা যে যে পথে এসেচি সে পথে আর যাবো না।

আবার ওদের দল বেরিয়ে পড়লো। দুদিন পরে সমুদ্র কল্লোল শুনে বনঝোপের আড়াল থেকে বার হয়ে ওরা দেখলে—সামনেই বিরাট সমুদ্র!

সনৎ চীৎকার করে বলে উঠলো—আলাট্টা ! আলাট্টা !

সুশীল বল্লে—তোমার এ চীৎকার সাজে না সনৎ। তুমি জেনোফনের বর্ণিত গ্রীক্ সৈন্য নও, সমুদ্রের ধারে তোমার বাড়ী নয়—

ইয়ার হোসেন বল্লে—ব্যাপারটা কি ? আমি তোমাদের কথা বুঝতে পারচিনে—

সনৎ বল্লে—জেনোফন বলে একজন প্রাচীনযুগের গ্রীক লেখক—নিজেও তিনি একজন সৈনিক—পারস্য দেশের অভিযান শেষ করে ফিরবার সমস্ত দুঃখ কষ্টটা 'দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন' বলে একখানা বইয়ে লিখে রেখে গিয়েছেন—তাই ও বলচে—

ইয়ার হোসেন তাচ্ছিল্যের সুরে বল্লে—ও !

জামাতুল্লা বল্লে—আমার একটা পরামর্শ শোনো। কম্পাসে দিক ঠিক করে চলো এবার উত্তর মুখে যাই—ওদিকটা দেখে আসা যাক—

সকলেই এ কথায় সায় দিলে। সূর্য্যের মুখ না দেখে সকলেরই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল। ওরা প্রথম দিনেই সমুদ্রের বালির ওপরে অনেকগুলো বড় বড় কচ্ছপ দেখতে পেলে। ইয়ার হোসেনের একজন অনুচর ছুটে গিয়ে একটাকে উল্টে চীৎ করে দিলে, বাকীগুলো তাড়াতাড়ি গিয়ে সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে পড়লো। মালয় দেশীয় দায়ের (মালয়েরা বলে 'বোলো') সাহায্যে কচ্ছপটাকে কাটা হোল, মাংসটা ভাগ করে

রান্না করে সকলে পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহার করলে। ভাগ করার অর্থ এই যে ইয়ার হোসেনের দল ও জামাতুল্লার রান্না হোত আলাদা—সুশীল ও সনতের আলাদা রান্না সনৎ নিজেই করতো।

একদিন সমুদ্রের ধারে বালির ওপরে কি একটা জানোয়ার দেখে সনৎ ছুটে এসে সবাইকে খবর দিলে।

সকলে গিয়ে দেখলে প্রকাণ্ড বড় শূওরের মত বড় একটা জানোয়ার বালির ওপর চুপ করে শুয়ে। তার থ্যাবড়া নাকের নীচে বড় বড় গোঁপ—মুখের ছুদিকে ছুটো বড় বড় দাঁত।

ইয়ার হোসেন বল্লে—এ এক ধরণের সিল—সিঙ্গাপুরের সমুদ্রে মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায় বটে।

সিলের মূল্যবান চামড়ার লোভে সনৎ ওকে গুলি করতে উদ্যত হোল।

ইয়ার হোসেন নিষেধ করে বল্লে—ওটা মেরো না—ও সিলকে বলে সি লায়ন, ও মারলে অলক্ষণ হয়।

পরদিন তাঁবু তুলে সকলে উত্তরদিকের জঙ্গল ভেদ করে রওনা হোল।

উত্তর দিকের জঙ্গলে সমুদ্রের ধার দিয়ে দিয়ে অনেকটা গেল ওরা। এক গাছ থেকে আর এক গাছে বড় বড় পুষ্পিত লতা, সারা বন সুগন্ধে আমোদ করে ঝুলে পড়েচে—সুবৃহৎ লতা, যেন অজগর সাপের নাগপাশে মহীরুহকে আলিঙ্গন বদ্ধ করেচে—রাশি রাশি বিচিত্র অর্কিড! বিচিত্র

ও উজ্জ্বলবর্ণের পাখীর দল ডালে ডালে—অদ্ভুত সৌন্দর্য্য বনের। সুশীল বল্লে—মিঃ হোসেন ও কি লতা জানেন? যেমন সুন্দর ফুল—আর লতা দেখা যাচ্চে না ফুলের ভারে—গন্ধও অদ্ভুত। ইয়ার হোসেন লতার নাম জানে না—তবে বল্লে, সিঙ্গাপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে ওরকম লতা সে দেখেচে।

সারাদ্বীপে গভীর বন। বনের ভেতর দিয়ে যাওয়া কঠিন ও অনবরত গাছপালা কেটে যেতে হয় পথ করবার জন্যে—কাজেই ওরা সমুদ্রের ধার বেয়ে চলছিল! একজায়গায় একটা নদী এসে সমুদ্রে পড়েচে বনের মধ্যে দিয়ে, নদী পার হয়ে যাওয়া কষ্টকর বলে ওরা বাধ্য হয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়লো। নদী সরু হবার নাম নেই—অনেকদূর বনের মধ্যে ঢুকে এখনও নদী বেশ গভীর।

সুশীল বল্লে—ওহে, নদীটা আমাদের দেশের একটা বড় খালের মত দেখচি। এ দ্বীপে এত বড় নদী আসচে কোথা থেকে? তেমন বড় পাহাড় কোথায়?

—নিশ্চয়ই বড় পাহাড় আছে বনের মধ্যে, সেদিকেই তো যাচ্চি—দেখা যাক—

আরও আধঘণ্টা সকলে মিলে গভীর জনহীন বনের মধ্যে দিয়ে চললো। বনের রাজ্য বটে এটা—সত্যিকার বন কাকে বলে এতদিন পরে প্রত্যক্ষ করলো সুশীল ও সনৎ।

হঠাৎ একজায়গায় একটা নাগকেশর গাছ দেখে সুশীল বলে উঠলো—এই ছাখো একটা আশ্চর্য্য জিনিস। এ গাছ এখানে কোথা থেকে এলো। ভারতবর্ষ ছাড়া নাগকেশর গাছ কোথাও এদিকে দেখা যায় না। নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ থেকে আমদানি এ গাছটা।

খুঁজতে খুঁজতে আশেপাশে আরও কয়েকটা নাগকেশর গাছ পাওয়া গেল। এত গভীর বনের মধ্যে নাগকেশর গাছ আনার মানেই হচ্চে এখানে কোনো ভারতীয় উপনিবেশের অস্তিত্ব ছিল পুরাকালে।

সনৎ বল্লে—কিন্তু এ গাছ তো খুব পুরোনো না, দেখেই মনে হচ্চে। আট ন'শো বছরের নাগকেশর গাছ কি বাঁচে?

—তা নয়। ঔপনিবেশিক ভারতীয়দের নিজেদের হাতে পোঁতা গাছের চারা এগুলো। বড় গাছগুলোর থেকে বীজ পড়ে পড়ে এগুলো জন্মেচে। এ গাছ অধস্তন চতুর্থ বা পঞ্চম পুরুষ, আসল গাছের!

সেদিনই সন্ধ্যার কিছুপূর্ব্বে সনৎ বনের মধ্যে একজায়গায় একটা কৃষ্ণপ্রস্তর মূর্ত্তি দেখে চীৎকার করে সবাইকে এসে খবর দিলে। ওরা ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখলে গভীর জঙ্গলের লতাপাতার মধ্যে একটা ভাঙা পাষাণ মূর্ত্তি—মূর্ত্তির মুণ্ডু নেই—তবে হাত পা দেখে মনে হয় শিবমূর্ত্তি ছিল সেটা। দুহাত উঁচু প্রস্তর বেদীর ওপর মূর্ত্তিটা বসানো, এক হাতে বরাভয়, অন্য হাতে ডমরু, গলায় অক্ষমালা—এত দূর দেশে এসে ভারতীয়

সংস্কৃতির এই চিহ্ন দেখে সুশীল ও সনৎ বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লো—সেখান থেকে যেন সরে যেতে পারে না। এই দুস্তর সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে তাদের পূর্ব্বপুরুষেরা হিন্দুধর্ম্মের বাণী বহন করে এনেছিল একদিন এদেশে, সুলু সমুদ্রের ওই ডুবো পাহাড় অতিক্রম করতে চীনা জাঙ্ক্‌ওয়ালা যে কৌশল দেখালে, এই কম্পাস ও ব্যারোমিটারের যুগের বহু, বহু পূর্ব্বে তাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সে কৌশল একদিন না যদি দেখাতে পারতেন—তবে নিশ্চয়ই এ দ্বীপে পদার্পণ তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মনে মনে সুশীল তাঁদের প্রণতি জানালে। নমোনমঃ দিগ্বিজয়ী পূর্ব্বপুরুষগণ, আশীর্ব্বাদ করো—যে বল ও তেজ তোমাদের বাহুতে, যে দুর্দ্ধর্ষ অনমনীয়তা ছিল তোমাদের মনে—আজ তোমার অধঃপতিত, দুর্ব্বল উত্তরপুরুষেরা যেন বল ও তেজের আদর্শে আবার নিজেদের গড়ে তুলতে পারে। সার্থক করতে পারে ভারতের নাম বিশ্বের দরবারে।

জামাতুল্লা ও ইয়ার হোসেনও চমৎকৃত হোল। এ বনেও একদিন মানুষ ছিল তাহোলে! এই যে গভীর বনে আজ শুধু অজগর আর ওরাং ওটাংয়ের বিচরণক্ষেত্র, এখানে একদিন সভ্য মানুষের পদশব্দ ধ্বনিত হয়েচে, সে মন্দির গড়েচে, মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেচে—এই সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার বলে মনে হোল ওদের কাছে।

জামাতুল্লাকে সুশীল বল্লে—কেমন এসব দেখেছিলে বলে মনে হয়?

—এসব দেখিনি। তবে এতে বোঝা যাচ্চে মানুষের বাসের নিকটে এসে পড়েচি।

—সে জায়গাটা কেমন?

—সে একটা সহর বাবুজি। তার বাইরে পাঁচিল ছিল, একসময়ে। এখন পড়ে গিয়েছে—

—কম্পাস দেখে দিক ঠিক করে ছিলে? ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউড্ ঠিক করে ছিলে?

—না বাবুজি, ও সব কিছু করিনি। কম্পাস ছিল না।

সকলের মনে আশার সঞ্চার হোল যে এবার নিশ্চয়ই সে প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের কাছাকাছি আসা গিয়েচে। কিন্তু তারপর তিন দিন কেটে গেল, চার দিন গেল, পাঁচ দিন গেল—আবার সামনে সমুদ্রের পূর্ব্বতীর, আবার সুনীল সুলু সি! কোথায় নগর, কোথায়ই বা কি। একখানা ইট বা পাথরও জঙ্গলের মধ্যে কোথাও কারো চোখে পড়'লো না আর। আবার হতাশ হয়ে পড়লো সকলে। জামাতুল্লাকে ইয়ার হোসেন বল্লে—জামাতুল্লা সাহেব, স্বপ্ন দেখোনি তো হিন্দু মন্দিরের আর সহরের? জামাতুল্লা গেল রেগে। ইয়ার হোসেনের অনুচরেরা নিজেদের মধ্যে কি বিড় বিড় করতে লাগলো।

সুশীল সনৎ ও জামাতুল্লাকে গোপনে ডেকে বল্লে···ইয়ার হোসেনের ওই লোকগুলোকে সামলানো কঠিন হয়ে পড়বে

যদি কিছু চিহ্ন না পাওয়া যায়—দেখচি ওগুলো ভারি বদমাইস।

জামাতুল্লা বল্লে—ভাববেন না বাবুজি, আমি ছুরি চালাবো, আপনাদের জন্যে প্রাণ দেবো। ওরা কি করবে! কাঠের ভেলা তৈরি করে স্থলু সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নিয়ে যাবো—ওই হল্‌দেমুখো চীনে জাঙ্ক্‌ওয়ালা বড় বাহাত্নরি করে গেল আপনাদের কাছে—দেখাবো ও কত বাহাত্নর।

একদিন সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেক আগে স্থশীল বনের মধ্যে পাখী শিকার করতে বেরুলো বন্দুক নিয়ে। কিছুদূর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে সে অস্পষ্ট গোধূলির আলোয় দূর থেকে একটা লম্বা পাহাড়মত দেখতে পেলে। আরও কাছে গিয়ে সে দেখলে পাহাড় ও তার মধ্যে একটা খাল, তাতে জল আছে—গভীর খাল। জলে পদ্মফুল ফুটে রয়েচে। ভাল করে চেয়ে দেখে সে বুঝলে ওপারে ওটা পাহাড় নয়, একটা উঁচু পাঁচীল হোতে পারে, এটা খাল নয়, মানুষের হাতে কাটা পরিখা হয়তো। প্রাচীরের ওপর বড় বড় গাছ গজিয়েচে, মোটা মোটা শেকড় পাঁচীলের গা বেয়ে এসে মাটিতে নেমেচে—তাদের ডালপালার ফাঁক দিয়ে জায়গায় জায়গায় পাঁচীলের গায়ের বড় বড় পাথরের চাঁইগুলো দেখা যাচ্চে।

স্থশীল আনন্দে ও বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল।

এই তবে সেই প্রাচীন নগরীর প্রাচীর ও পরিখা। এবিষয়ে ভুল থাকতে পারে না—তবে হয় তো সে উল্টো দিক থেকে

এটাকে দেখচে। নগরীর সিংহদ্বার অন্যদিকে আছে কোথাও।

সে সকলকে গিয়ে খবর দিলো তখন সন্ধ্যার অন্ধকার সমগ্র বনভূমিকে আচ্ছন্ন করেচে। ইতিমধ্যেই ওরাং ওটাং ও শৃগালের ডাক শোনা যাচ্চে। দু একটা নিশাচর পাখী ছাড়া অন্য পাখীর কূজন থেমে গিয়েচে। ডালপালার ফাঁকে ঊর্দ্ধে কৃষ্ণ আকাশে নক্ষত্ররাজি দেখা দিয়েচে।

ইয়ার হোসেন বারণ করলে—এখন না, এই রাত্রিকালে তাঁবু ছেড়ে কোথাও যেওনা কাল সকালে দেখা যাবে।

সুশীলের আনা পাখী দিয়ে তাঁবুতে ভোজ হোল রাত্রে।

জামাতুল্লা বল্লে—পাঁচীল যখন বেরিয়েছে—তখন আমায় মিথ্যেবাদী বলে বদনাম আর কেউ দিতে পারবে না। পরদিন সকলে গিয়ে দেখলে সত্যই বিরাট প্রাচীর ও পরিখার অস্তিত্ব ওদের সেখানে কোনো প্রাচীন নগরীর অস্তিত্বের নিদর্শনস্বরূপ বিরাজমান।

পরিখার জলে পদ্ম ফুল দেখে সুশীল ও সনৎ ভাবলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক যেন ঐ ফুল। আট শো বছর আগে যে হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ প্রথম পদ্মলতা এনে দুর্গ পরিখার জলে পুঁতে দেয় তারা আজ কোথায়? কিন্তু জলে একবার শেকড় গেড়ে যে পদ্মলতা বেঁচে উঠেছিল. সে বংশানুক্রমে আজও অক্ষয় হয়ে বিরাজ করচে এই গভীর অরণ্যের মধ্যে। ইয়ার হোসেনের আদেশে তার দুজন অনুচর জল মেপে

দেখলে এখানে পার হওয়া অসম্ভব। পরিখার জল বেশ গভীর। পরিখার এক বাহুধরে একদিকে একদল ও অন্যদিকে অন্য বাহুর সন্ধানে অন্যদল বার হোল।

শেষের দলে গেল সুশীল।

উত্তর থেকে দক্ষিণে লম্বা প্রাচীর ও পরিখার উত্তর দিকে আধ মাইল টাক গিয়ে ওদের দল সবিস্ময়ে দেখলে প্রাচীরের এক স্থান ভগ্ন, মাঝখান বেয়ে বেশ একটা রাস্তা যেন ছিল সুপ্রাচীনকালে, এখন অবিশ্যি ঘন বন। দেখে মনে হয় শত্রু দ্বারা দুর্গ বা নগরপ্রাচীর হয়তো এখানে ভগ্ন হয়ে থাকবে নতুবা এর অন্য কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না।

দেখা গেল পরিখার সেইখানে প্রাচীন খালে বোধ হয় কাঠের সেতু ছিল এখন সেটা পড়েচে ভেঙে জলে। জলের গভীরত্ব সেখানে কম। কাঠের সেতু প্রথমে দেখা যায়নি। ইয়ার হোসেনের জনৈক অনুচর প্রথমে জলের ধারে একটা শেকল দেখতে পায়। শেকলটা টেনে জলের মধ্যে থেকে একখণ্ড লোহার পাত বেরুলো। আন্দাজ করা কঠিন নয় যে এই লোহার পাত কাঠের চওড়া তক্তার গায়ে লাগানো ছিল। এই অনুমানটুকু ছাড়া কাঠের সেতুর অস্তিত্বের অন্য কোনো নিদর্শন এতকাল পরে কি ভাবে পাওয়া সম্ভব হতে পারে।

ইয়ার হোসেন বল্লে—এখান দিয়ে পার হওয়া যাক—জল গভীর হবে না।

সুশীল সামান্য একটু আপত্তি করলে—অথচ কেন যে করলে তা সে নিজেই জানে না।

প্রথমে নামলো ইয়ার হোসেন নিজে—তার পেছনে নামলো সুশীল। হাত তিন চার মাত্র জলে যখন ওরা গিয়েচে তখন ওরা দেখলে সামনে জলের যা গভীরতা, তাতে আর অগ্রসর হওয়া চলবে না। ঠিক সেই সময় ওদের নিকট থেকে হাত পাঁচ ছয় দূরে ইয়ার হোসেনের একজন অনুচর, যে শিকল টেনে তুলেছিল জল থেকে সে নামলো, উদ্দেশ্য ওদের পাশাপাশি সেও পরিখা পার হবে। কিন্তু পরক্ষণেই এক ভয়াবহ কাণ্ড ঘটলো।

সুশীল চোখের কোণ দিয়ে অল্পক্ষণের জন্যে দেখতে পেলে লোকটার ছ'সাত হাত দূরে একটা ছোট্ট কাঠের মত কালো কি একটা জিনিষ যেন ভাসচে! দু সেকেণ্ড মাত্র, পরেই হঠাৎ যেন ভূমিকম্পে বিরাট জলোচ্ছ্বাস ঘটলো, একটা আর্ত্ত চীৎকার ধ্বনি অল্পক্ষণের মধ্যে শোনা গেল···কিসের একটা প্রবল ঝাপটা এসে ওদের জলের ওপর কাৎ করে ফেললে··· ওদের দু'জনকে।

পরক্ষণেই ইয়ার হোসেনের সেই অনুচর অদৃশ্য!

কি ঘটলো ব্যাপারটা কেউ বুঝতে পারলে না—অবিশ্যি এক মিনিটও হয়নি এর মধ্যে সব ঘটে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ডাঙায় যারা ছিল তারা চেঁচিয়ে উঠলো—শয়তান শয়তান!

ইয়ার হোসেন আকুলভাবে চীৎকার করে বল্লে—ডাঙায় ওঠো ডাঙায় ওঠো !

হতভম্ব সুশীল কাদা হাঁচ্‌ড়ে মরিবাঁচি ডাঙায় উঠলো—পাশাপাশি ইয়ার হোসেনও উঠলো, জলে চেয়ে দেখলে জল কাদা ঘোলা হয়েচে, ইয়ার হোসেনের অনুচর নিশ্চিহ্ন।

সুশীল ও ইয়ার হোসেন তখনও হাঁপাচ্চে ; সুশীলের বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিট্‌চে।

সে ভীতকণ্ঠে বল্লে—কি হোল ?

ইয়ার হোসেন বল্লে—আমাদের সাবধানে জলে নামা উচিত ছিল, এই সব প্রাচীন কালের জলাশয়ে কুমীর থাকা সম্ভব, একথা ভুলে গিয়েছিলাম। খোঁজো সবাই—

কুমীর ! সুশীল অবাক হয়ে গেল। কে জানতো নগরীর পরিখায় কুমীর থাক্‌তে পারে ! দুর্গপরিখার প্রহরী এরা—হয়তো প্রাচীন দিনেই শত্রুরোধকল্পে জলের মধ্যে কুমীর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, সুবিশ্বস্ত প্রহরীর ন্যায় এখনও তারা বাইরের লোকের অনধিকার প্রবেশে বাধাদান করচে।

খুঁজে কিছু হোল না—জল কিছুক্ষণ পরে হতভাগ্য অনুচরের রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো। ইয়ার হোসেন বল্লে—আজ থামলে আমাদের চলবে না—এগোও। নগরের ফটক খোঁজো—

সুশীলও বল্লে—জলের মধ্যে অজানা বিপদ। জল পার হওয়ার দরকার নেই—হেঁটে বা সাঁতরে। কোথাও সেতু আছে কিনা দেখা যাক্।

আবার উত্তর মুখে সকলে চললো। মাইল দুই সোজা চলতে সন্ধ্যা হয়ে গেল—কারণ ভীষণ জঙ্গল কেটে কেটে অগ্রসর হতে হচ্ছে। আগুন জ্বেলে তাঁবু ফেলে সেদিন সকলে সেখানে রাত্রি কাটাবার আয়োজন করলে। এমন সময় বহুদূরে একটা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল—তার উত্তরে ওরাও একটা আওয়াজ করলে। দুটি দলের মধ্যে যোগসূত্র রাখবার একমাত্র উপায় এই বন্দুকের আওয়াজ—অনেকদূরে থেকে দক্ষিণগামী দলের এ হোল সঙ্কেতধ্বনি। পরদিন সকালে আরও একমাইল গিয়ে প্রাচীরের উত্তর দিক থেকে পূবদিকে মুখ ফেরালে। অর্থাৎ এদিকে আর সহর নেই। প্রাচীর ধরে সবাই বাঁকতে গিয়ে দেখলে পরিখার এপারে অনেকগুলো স্তূপ, স্তূপের ওপর বিরাট জঙ্গল। বড় বড় পাথর গড়িয়ে এসে পড়েচে স্তূপ থেকে নীচে—সেগুলো বেশ চৌকস করে কাটা। সম্ভবতঃ স্তূপের ওপর কোনো দুর্গ ছিল যা ঠিক নগরপ্রাচীরের উত্তর পশ্চিম কোণ পাহারা দিত।

পশ্চিম মুখে কতটা যেতে হবে কেউ জানে না। কারণ তারা দৈর্ঘ্য ধরে যাচ্চে না প্রস্থ ধরে যাচ্ছে, তা জানবার সময় এখনও আসেনি। সেদিনও কেটে গেল বনের মধ্যে; সন্ধ্যা নামলো। সন্ধ্যায় যে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল, তার আওয়াজ খুব ক্ষীণ ও অস্পষ্ট।

সুশীল বল্লে—আমরা দৈর্ঘ্য অতিক্রম করেছি—প্রস্থ ধরে চলেচি। বুঝেচেন মিঃ হোসেন?

—এবার বুঝলাম। ওদিকে যে দল গিয়েচে তারা ওদিকের শেষপ্রান্তে পৌঁছে বন্দূক ছুঁড়চে। অন্ততঃ সাত মাইল দূর এখান থেকে।

পরদিন বেলা দশটার মধ্যে নগরীর সিংহদ্বার পাওয়া গেল। সেখানটাতে পরিখার ওপর পাথরের সেতু। এপারে সেতু রক্ষার জন্য দুর্গ ছিল, বর্তমানে প্রকাণ্ড উঁচু জঙ্গলে ভরা ঢিবি।

সকলে ব্যস্ত হয়ে সেতু পার হয়ে সিংহদ্বার লক্ষ্য করে অল্প কিছুদূর অগ্রসর হয়েই থেমে গেল।

সিংহদ্বারের খিলান ভেঙে পড়তো—যদি বট জাতীয় কয়েকটি সুবৃহৎ ও সুপ্রাচীন বৃক্ষের শিকড় আষ্ঠেপৃষ্ঠে তাকে না জড়িয়ে ধরে রাখতো। সিংহদ্বারের দুপাশে অদ্ভুত দুই প্রস্তরময় মূর্ত্তি—নাগরাজ বাসুকি ফণা তুলে আছে সামনে, পেছনে তিনমুখ বিশিষ্ট কোনো দেবতার মূর্ত্তি। সূর্য্যের আলো ওপরের বট বৃক্ষের নিবিড় ডালপালা ভেদ করে মূর্ত্তি দুটীর গায়ে বাঁকা ভাবে এসে পড়েচে।

গম্ভীর শোভা। সুশীল শুধু নয়, দলের সকলেই দাঁড়িয়ে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে রইল এই কারুকার্য্যময় সিংহদ্বার ও প্রাচীন যুগের শিল্পীর হাতের এই ভাস্কর্য্যের পানে।

সুশীল হাত জোড় করে প্রণাম করলে মূর্ত্তি দুটির উদ্দেশ্যে। সে পুরাতত্বে বা দেবমূর্ত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ না হোলেও আন্দাজ করলে এ দুটি তিনমুখ বিশিষ্ট শিবমূর্ত্তি।

সুলু সমুদ্রের এই জনহীন অরণ্যাবৃত দ্বীপে প্রাচীন ভারতের

শক্তি ও তেজ একদিন এখানে এই দেবমূর্ত্তিকে স্থাপিত করেছিল আজ ভারত অধঃপতিত,—দাসত্বের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত, হে দেব, তোমার যে ভক্তগন একদিন তোমাকে এখানে বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত করেছিল—তারা আজ নেই—তাদের অযোগ্য বংশ-ধরকে তুমি সেই শৌর্য্য ও সাহস ভিক্ষা দাও, তারা বীর পূর্ব্ব-পুরুষদের যোগ্য বংশধর করে দাও হে রুদ্রভৈরব।

ইয়ার হোসেন পর্য্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিল। এই বিরাট ভাস্কর্য্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সে বল্লে—যদি আমার দিন আসে, এই মূর্ত্তি সিঙ্গাপুরের মিউজিয়মে দান করবার ইচ্ছে রইল—

সুশীল বল্লে—তা কখনো করবেন না মিঃ হোসেন, যেখান-কার দেবতা সেখানেই তাঁকে শান্তিতে থাকতে দিন। অমঙ্গলকে ডেকে আনবেন না।

সিংহদ্বার অতিক্রম করে ওরা নগরীর মধ্যে ঢুকলো। কিন্তু অল্প কিছুদূর গিয়েই দেখলে এত দুর্ভেদ্য জঙ্গল, যে দশ হাত এগিয়ে যাবার উপায় নেই বন না কাটলে। সিংহদ্বারের সামনেই নিশ্চয়ই প্রাচীন নগরের রাজপথ ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে সে রাজপথের ওপরই তিন চারশো বছরের পুরানো বট জাতীয় বৃক্ষ, বন্য রবার, বন্য ডুরিয়ান ও ডুমুর গাছ। এই সব বড় গাছের নীচে আগাছা ও কাঁটালতার জঙ্গল। ওরাং ওটাংও এই জঙ্গল ভেদ করে অগ্রসর হতে পারে না—মানুষ কোন ছার।

ইয়ার হোসেনের হুকুমে মালয় অনুচরেরা 'বোলো' দিয়ে জঙ্গল কেটে কোনো রকমে একটু সুঁড়িপথ বার করতে করতে চললো।

সুশীল বল্লে—এ জঙ্গল তো দেখছি নগরের বাইরে যেমন ছিল, এখনও তেমনি। কেবল এটা পাঁচিলের মধ্যে এই যা তফাৎ। কে একজন চেঁচিয়ে উঠলো—দেখুন! দেখুন!

সকলে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলে সামনে প্রকাণ্ড একটা মন্দিরের চূড়া লতা-ঝোপের আররণ থেকে অনেক উঁচুতে মাথা বের করে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের কাছে যাবার কোনো উপায় নেই—অনেকদূর থেকে বড় বড় দেওয়াল ভাঙ্গা পাথর ছড়িয়ে জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে অন্ততঃ দেড়শো হাত পর্য্যন্ত।

ওরা ডিঙিয়ে লাফিয়ে কোনো রকমে মন্দিরের সামনে বড় চত্বরের কাছে এল—কিন্তু সামনেই গোপুরমের মত উঁচু পাইলন টাওয়ার। তার সুবিশাল পাথরের খিলান ফেটে চৌচির হয়ে সিংহদ্বারের মতই আষ্টে পৃষ্টে বড় বড় শেকড় আর লতার বাঁধনে আজ কত যুগ যুগ ধরে ঝুলচে—তার ঠিকানা কারো কাছে নেই। গোপুরম ছাড়িয়ে মন্দিরের দেওয়াল, বিকটাকার দৈত্যের মুখের মত সারি সারি অনেকগুলো মুখ দেওয়ালের গায়ে বেরিয়ে আছে—সুশীল আঙুল দিয়ে ওদের দেখিয়ে বল্লে, দেখো কি চমৎকার কাজ। হয় পাথরের কড়ি নয়তো পয়োনালি, যাকে ইংরিজিতে বলে গর্গয়েল। অর্থাৎ বিকট জানোয়ারের মুখ বসানো নালি।

সকলেই অবাক হয়ে সেই কল্পনাসৃষ্ট ভীষণ মুখগুলোর দিকে চেয়ে রইল। সুন্দরকে গড়ে তোলে সেও যেমন কৌশলী শিল্পী

ভীষণকে যে রূপ দেয়, সে শিল্পীও ঠিক তত বড়। সুশীলের মনে পড়লো আনাতোল ফ্রান্সের সেই গল্প, শয়তানকে এমন বিকট করে আঁকলে শিল্পী, যে রাত্রের অন্ধকারে শয়তান এসে শিল্পীকে জানিয়ে জিগ্যেস করলে—তুমি আমাকে এর আগে কোথায় দেখেছিলে যে অমন করে এঁকেছ? শিল্পী বল্লে —আপনি কে?

শয়তান বল্লে—আমি লুসিফার! যাকে তোমরা বলো শয়তান। ও নামটায় আমার ভয়ানক আপত্তি তা জানো? তুমি কি বিশ্রি করে এঁকেচ আমায়। আমি কি অত খারাপ দেখতে? দেখোনা আমার দিকে চেয়ে!

শিল্পী দেখলে শয়তানের মূর্ত্তি দেখতে বেশ সুন্দর, তবে মুখশ্রী ঈষৎ বিষন্ন। ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে বল্লে— আমায় মাপ করুন, আমি এর আগে দেখিনি আপনাকে। আমি স্বীকার করছি আমার ভুল হয়েচে। আমি ভুল শুধরে নেবো—

শয়তান হাসতে হাসতে বল্লে—তাই শুধরে নাও গে যাও— নইলে তোমার কান মলে দেবো—

যাক্। ওরা সবাই খিলানের তলা দিয়ে অগ্রসর হয়ে মন্দিরের মধ্যেকার প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়ালো। শুধু ভীষণ কাঁটাগাছ আর বেত, খুব ভাল বেত, যা থেকে মলক্কা বেতের ছড়ি হয়।

সনৎ ছেলেমানুষ, ভাল বেত দেখে বলে উঠলো—দাদা, একটা বেত কাট্‌বো ?

ইয়ার হোসেন তাকে ধমক দিয়ে কি বলতে যাচ্চে, এমন সময় একটা সুন্দর পাখী এসে সামনের বন্য রবারের গাছের ডাল থেকে মন্দিরের ভাঙা পাথরের কার্ণিসে বসলো। সবাই হাঁ করে চেয়ে রইল পাখীটার দিকে। কি সুন্দর দীর্ঘ পুচ্ছ ঝুলে পড়েচে কার্ণিস্ থেকে প্রায় এক হাত—ময়ুরের পুচ্ছের মত। হল্‌দে ও শাদা আঁজি কাটা পালকের গায়ে—পিঠের পালকগুলো ঈষৎ বেগুনি।

ইয়ার হোসেন বল্লে—টিকাটুরা, যাকে সাহেব লোক বলে, বার্ড অফ্ প্যারাডাইজ—খুব সুলক্ষণ।

সনৎ বল্লে—বাঃ, কি চমৎকার! এই সেই বিখ্যাত বার্ড অফ্ প্যারাডাইজ! কত প'ড়েছি ছেলেবেলায় এদের কথা—

সুশীল বল্লে—সুলক্ষণ কুলক্ষণ দুরকমই দেখচি। কুমীর নিলে একজনকে, আবার বার্ড অফ্ প্যারাডাইজ দেখা গেল এটা সুলক্ষণ—

মন্দিরের বিভিন্ন কুঠুরি। প্রত্যেক কুঠুরির দেওয়ালে সারবন্দি খোদাই কাজ! সুশীল একখানা পাথরের ইঁট মনোযোগের সঙ্গে দেখলে। একজন ভারতবর্ষীয় হিন্দু রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট, তাঁর পাশে বোধহয় গ্রহবিপ্র পাঁজি পড়চেন, সামনে এক সার লোক মাথা নীচু করে যেন রাজাকে অভিবাদন

করচে। রাজার এক হাতে একটা কি পাখী—হয় পোষা শুক, নয়তো শিক্‌রে বাজ।

ভারত! ভারত! কত মিষ্টি নাম, কি প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অমূল্যভাণ্ডার। তার নিজের দেশের মানুষ একদিন কম্পাস ব্যারোমিটারহীন যুগে সপ্ত সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে এখানে এসে হিন্দুধর্ম্মের নিদর্শন রেখে গিয়েছিল, তাদের হাতে গড়া এ কীর্ত্তির ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে গর্ব্বে ও আনন্দে সুশীলের বুক দুলে উঠলো। বীর তারা, দুর্ব্বল হাতে অসি ও বর্শা ধরেনি, ধনুকে জ্যা রোপণ করেনি—সমুদ্র পাড়ি নিয়েচে—এই অজ্ঞাত বিপদসঙ্কুল মহাসাগর, হিন্দুধর্ম্মের জয়ধ্বজা উড়িয়ে দিগ্বিজয় করে নটরাজ শিবের পাষাণ দেউল তুলেচে সপ্ত সমুদ্র পারে।

পরবর্ত্তী যুগের যারা স্মৃতিশাস্ত্রের বুলি আউড়ে টোলের ভিটেয় বাঁশবনের অন্ধকারে বসে বলে গিয়েছিল—সমুদ্রে যেওনা, গেলে জাতটি একেবারে যাবে—হিন্দুত্ব একেবারে লোপ পাবে, তারা ছিল গৌরবময় যুগের বীর পুর্ব্বপুরুষদের অযোগ্য বংশধর, তাদের স্নায়ূ দুর্ব্বল, মন দুর্ব্বল, দৃষ্টি ক্ষীণ, কল্পনা স্থবির।

তারা হিন্দু নয়—হিন্দুর কঙ্কাল।

দুদিন ধরে ওরা বনের মধ্যে কত প্রাচীন দেওয়াল, ধ্বংসস্তূপ দরজা, খিলান ইত্যাদি দেখে বেড়ালে। জ্যোৎস্না রাত্রি, গভীর রাত্রে যখন ওরাং ওটাংয়ের ডাকে চারিপাশের ঘন জঙ্গল মুখরিত হয়ে ওঠে, অজ্ঞাত নিশাচর পক্ষীর কুস্বর শোনা যায়, বন্য

রবারের ডালপালায় বাতুড় ডানা ঝটাপটি করে, তখন এই প্রাচীন হিন্দু নগরীর ধ্বংসস্তুপে বসে সুশীল যেন মুহূর্ত্তে কোন্ মায়ালোকে নীত হয়,—অতীত শতাব্দীর হিন্দু সভ্যতার মায়ালোক—দিগ্বিজয়ী বীর সমুদ্রগুপ্ত, কবি ও বীন্-বাজিয়ে যে মহাযুগের প্রতীক, হুন বিজেতা মহারথ স্কন্দগুপ্তের কোদণ্ড টঙ্কারে যে যুগের আকাশ সন্ত্রস্ত।

সুশীল স্বপ্ন দেখে। সনৎকে বলে বুঝলি সনৎ, জামাতুল্লাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ যে ও আমাদের এনেচে এখানে। এ সব না দেখলে ভারতবর্ষের গৌরব কিছু বুঝতাম না।

সনৎ এ কথায় সায় দেয়। টাকার চেয়ে এর দাম বেশি।

ইয়ার হোসেন কিন্তু এসব বোঝে না। সে দিন দিন উগ্র হয়ে উঠচে। এই নগরীর ধ্বংসস্তুপে প্রায় দশদিন কাটলো। অথচ ধনভাণ্ডারের নামগন্ধও নেই, সন্ধানই মেলে না। জামাতুল্লাকে একদিন স্পষ্ট শাসালে—যদি টাকাকড়ির সন্ধান না মেলে তো তাকে এই জঙ্গলে টেনে আনবার মজা সে টের পাইয়ে দেবে।

জামাতুল্লা সুশীলকে গোপনে বল্লে—বাবুজি, ইয়ার হোসেন বদমাইস্ গুণ্ডা—ও না জানি কি গোলমাল বাধায়।

সুশীল ও সনৎ সর্ব্বদা সজাগ হয়ে থাকে রাত্রে, কখন কি হয় বলা যায় না। ইয়ার হোসেনের সশস্ত্র অনুচরের দল দিন দিন অসংযত হয়ে উঠচে।

একদিন জামাতুল্লা বনের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে একজায়গায়

একটী বড় পাথরের থাম আবিষ্কার করলে। থামের মাথায় ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে পদ্ম তৈরি করা হয়েচে। সুশীলকে ডেকে নিয়ে গেল জামাতুল্লা, সুশীল এসব দেখে খুসি হলো। সুশীল ও সনৎ তুজনে গভীর বনের মধ্যে ঢুকে থামটা দেখতে গেল।

সেখানে গিয়েই সুশীল দেখলে থামটার সামনে আড় ভাবে পড়ে প্রকাণ্ড একটা পাথরের চাঙ্—যেন একখানা চৌরস করা সানের মেঝে। সুশীল ক্যামেরা এনেচে থামটার ফটো নেবে বলে, পাথরটা সরিয়ে না দিলে পদ্ম-শির স্তম্ভটার ছবি নেওয়া সম্ভব নয়।

জামাতুল্লাকে বল্লে—পাথরখানা ধরাধরি করে এসো সরাই—

সরাতে গিয়ে পাথরখানা সেই কাৎ অবস্থা থেকে সোজা হয়ে পড়লো, অমনি সনৎ চীৎকার করে বল্লে—দেখ, দেখ—

সকলে সবিস্ময়ে দেখলে যেখানে পাথরটা ছিল, সেখানে একটা সুড়ঙ্গ যেন মাটীর নীচে নেমে গিয়েচে। জামাতুল্লা ও সুশীল সুড়ঙ্গের ধারে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলে, সুড়ঙ্গটা হঠাৎ বেঁকে গিয়েচে, প্রথমটা সেজন্যে মনে হয় গর্ত্তটা নিতান্তই অগম্ভীর।

সুশীল বল্লে—আমি নামবো—

জামাতুল্লা বল্লে—তা কখনো করতে যাবেন না বিপদে পড়বেন। কি আছে গর্ত্তের মধ্যে কে জানে?

সুশীল বল্লে—নেমে দেখতেই হবে। আমি এখানে থাকি, তোমরা গিয়ে তাঁবু থেকে মোটা দড়ি হাত চল্লিশ, টর্চ্চ আর রিভালভার নিয়ে এসো। ইয়ার হোসেনকে কিছু বোলো না।

সব আনা হোল। সুশীল ও জামাতুল্লা দুজনে সুড়ঙ্গের মধ্যে নামলে। খানিক দূর নামলে ওরা, পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি, পনেরো ষোলো ধাপ নেমেই কিন্তু দুজনে হতাশ হোল দেখে সামনে আর রাস্তা নেই। সিঁড়ি গিয়ে শেষ হয়েচে একটা গাঁথা দেওয়ালের সামনে।

সুশীল বল্লে—এর মানে কি জামাতুল্লা সাহেব?

—বুঝলাম না বাবুজি। যদি যেতেই দেবেনা, তবে সিঁড়ি গেঁথেচে কেন?

রাত হয়ে আসচে। ওরা দুজনে টর্চ্চ ফেলে চারিদিক ভাল করে দেখতে লাগলো। হঠাৎ সুশীল চেঁচিয়ে উঠে বল্লে দেখ, দেখ। দুজনেই অবাক হয়ে দেখলে মাথার ওপরে পাথরের গায়ে ওদের সুপরিচিত সেই চিহ্ন খোদা—আয়স্কান্ত মণির ওপর যে চিহ্ন খোদা ছিল। ভারতীয় স্বস্তিক চিহ্ন, প্রত্যেক বাহুর কোণে এক এক জানোয়ারের মূর্ত্তি—সর্প, বাজপাখী, বাঘ ও কুমীর।

—এই সেই আঁক-জোক বাবুজি, কিন্তু এর মানে কি, সিঁড়ি বন্ধ করলে কেন বুঝলেন কিছু?

দুজনেই হতভম্ভ হয়ে গেল। সুশীল সামনের পাথর

খানাতে হাত দিলে, বেশ মসৃণ, মাপ নিয়ে চৌরস করে কেটে কে তৈরী করে রেখেচে।

কিছুই বোঝা গেল না—অবশেষে হতাশ হয়ে ওরা গর্ত্ত থেকে উঠে পড়ে তাঁবুতে ফিরে এল সনৎকে নিয়ে। সেখানে কাউকে কিছু বল্লে না। পরদিন দুপুরবেলা সুশীল একা জায়গাটায় গেল। আবার সুড়ঙ্গের মধ্যে নামলে। ওর মনে একথা বিশেষ ভাবে জেগে ছিল লোকে এইটুকু গর্ত্তে ঢুকবার জন্যে এরকম সিঁড়ি গাঁথে না। এ সুড়ঙ্গ নিশ্চয় আরও অনেক বড়। কিন্তু তবে দশ ধাপ নেমেই পাথর দিয়ে এমন শক্ত করে বোঁজানো কেন?

এ গোলমেলে ব্যাপারের কোনো মীমাংসা করা যায় না দেখা যাচ্ছে; সুশীল চারিদিকে চেয়ে দেখলে মাথার ওপরে পাথরের গায়ে সেই অদ্ভুত চিহ্নটি সুস্পষ্ট খোদাই করা আছে। এ চিহ্নই বা এখানে কেন? ভাল করে চেয়ে চিহ্নটি দেখতে দেখতে ওব চোখে পড়লো, যে পাথরের গায়ে চিহ্নটি খোদাই করা তার এক কোণের দিকে আর একটা কি খোদাই করা আছে। সুড়ঙ্গের মধ্যে অন্ধকার খুব না হোলেও আলোও তেমন নয়। সুশীল টর্চ্চ ফেলে ভাল করে দেখলে—চিহ্নটি আর কিছুই নয়, ঠিক যেন একটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ রাখিবার সামান্য খোল। খোলের চারিপাশে দুটী লতার আকারের বলয় কিংবা অন্য কোনো অলংকার পরস্পর যুক্ত। সুশীল কি মনে ভেবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের খোলে নিজের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চেপে দেখতে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সামনের পাথর যেন কলের দোরের মত সরে একটা মানুষ যাবার মত ফাঁক হয়ে গেল। সুশীল অবাক এ যেন সেই আরব্য উপন্যাসের বর্ণিত আলিবাবার গুহা!

সে বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখলে সিঁড়ির পর সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গিয়েচে। সুশীল সিঁড়ি দিয়ে নামবার আগে উঁকি মেরে চাইলে অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে বহু যুগ আবদ্ধ দূষিত বাতাসের বিষাক্ত নিঃশ্বাস যেন ওর চোখে মুখে এসে লাগলো। তখন কিন্তু সুশীলের মন আনন্দে কৌতূহলে চঞ্চল হয়ে উঠেচে, বসে ভাববার সময় নেই। ও তাড়াতাড়ি কয়েক ধাপ নেমে গেল।

আবার সিঁড়ি বেঁকে গিয়েচে কিছুদূর গিয়ে। এবার আর সামনে পাথর নেই, সিঁড়ি এঁকে বেঁকে নেমে চলেচে। সুশীল একবার ভাবলে তার আর যাওয়া উচিত নয়। কতদূর সিঁড়ি নেমেচে এই ভীষন অন্ধকূপের মধ্যে কে জানে? কিন্তু কৌতুহল সংবরণ করা ওর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়লো। ও আরও অনেক খানি নীচে নেমে গিয়ে দেখলে এক জায়গায় সিঁড়ি হঠাৎ শেষ হয়ে গেলো। টর্চ্চ জ্বেলে নীচের দিকে ঘুরিয়ে দেখলে কোন দিকে কিছু নেই—পাথর বাঁধানো চাতাল বা মেজের মত তলাটা সব শেষ, আর কিছু নেই। ইংরাজিতে যাকে বলে dead end ও সেখানে পৌঁছে গিয়েচে। সুশীল হতভম্ব হয়ে গেল।

যারা এ সিঁড়ি গেঁথেছিল, তারা কি জন্যে এত সতর্কতার

সঙ্গে এত কষ্ট করে সিঁড়ি গেঁথেছিল যদি সে সিঁড়ি কোথাও না পৌঁছে দেয় ?

চাতালের দৈর্ঘ্য হাত তিনেক, প্রস্থ হাত আড়াই। খুব একখানা বড় পাথরের দ্বারা যেন সমস্ত মেঝে বা চাতালটা বাঁধানো। তন্ন তন্ন করে খুঁজে চাতালের কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। সুশীল বাধ্য হয়ে বোকা বনে উঠে চলে এসে জামাতুল্লা ও সনৎকে সব বল্লে। ওরা পরদিন লুকিয়ে তিনজনে সেখানে গেল, সিঁড়ি দিয়ে নামলে, সামনে সেই চাতাল। সিঁড়ির শেষ।

জামাতুল্লা বল্লে—একি তামাসা আছে বাবুজি—আমি তো বেকুব বনে গেলাম।

তিন জনে মিলে নানাভাবে পাথরটা দেখলে, এখানে টিপলে ওখানে চাপ দিলে—হিমালয় পর্ব্বতের মতই অনড়। কোথাও কোনো চিহ্ন নেই পাথরের গায়ে। মিনিট কুড়ি কেটে গেল। মিনিট কুড়ি সেই অন্ধকার ভূগর্ভে কাটানো বিপজ্জনকও বটে, অস্বস্তিকরও বটে।

সুশীল বল্লে—ওঠো সবাই, আর না এখানে।

হঠাৎ জামাতুল্লা বলে উঠলো—বাবুজি, একটা কথা আমার মনে এসেচে।

তুজনেই বলে উঠলো—কি ? কি ?

—গাঁতি দিয়ে এই পাথর খানা খুঁড়ে তুলে দেখলে হয়। কি বলেন ?

তখন ওরাও ভাবলে এই সামান্য কথাটা। যে কথা' সেই কাজ। জামাতুল্লা লুকিয়ে তাঁবু থেকে গাঁতি নিয়ে এল। পাথর খুড়ে সাবলের চাড় দিয়ে তুলে ফেলে যা দেখলে ওরা যেমন আশ্চর্য্য হোল, তেমনি উত্তেজিত হয়ে উঠলো। আবার সিঁড়ির ধাপ। কিন্তু দশ ধাপ নেমে গিয়ে সিঁড়ি বেঁকে গেল—আবার সামনে চৌরস পাথর দিয়ে সুড়ঙ্গ বোঁজানো। মাথার ওপরকার পাথরে পূর্ব্ববৎ চিহ্ন পাওয়া গেল বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে টিপে আবার সে পাথর ফাঁক হোল। আবার সিঁড়ি কিন্তু কিছুদূর নেমে আবার পাথর বাঁধানো চাতাল—আবার সেই dead end—নির্দ্দেশহীন শূন্য।

অমানুষিক পরিশ্রম। আবার পাথর তুলে ফেলা হোল—আবার সিঁড়ি। সুশীল বল্লে—যারা এ গোলকধাঁধা করেছিল, তারা খানিকদূর গিয়ে একবার একখানা পাথর সোজা করে পথ বুজিয়েছে তার পরেরটা সিঁড়ির মত পেতে পথ বুজিয়েচে এই এদের কৌশল বেশ বোঝা যাচ্ছে। জামাতুল্লা ওদের সতর্ক করে দিলে। বল্লে—বাবুজি, অনেকটা নীচে নেমে এসেচি। খারাপ গ্যাস থাকতে পারে দম বন্ধ হয়ে মারা যেতে পারি সবাই। তাঁবুতেও সন্দেহ করবে। চলুন আজ ফিরি।
তাঁবুতে ফিরবার পথে জামাতুল্লা বল্লে—বাবুজি, ইয়ার হোসেনকে এর খবর দেবেন না।

—কেন?

—কি জানি কি আছে ওর মধ্যে। যদি রত্ন ভাণ্ডারের

সন্ধানই পাওয়া যায়, তবে ইয়ার হোসেন কি করবে বলা যায় না। ওর সঙ্গে লোক বেশি। প্রত্যেকে গুণ্ডা ও বদমাইস। মানুষ খুন করতে ওরা এতটুকু ভাববে না। ওদের কাছে মশা টিপে মারাও যা, মানুষ মারাও তাই।

ইয়ার হোসেনের মন যথেষ্ট সন্দিগ্ধ। তাঁবুতে ফিরতে সে বল্লে—কোথায় ছিলে তোমরা ?

সুশীল বল্লে—ফটো নিচ্ছিলাম।

ইয়ার হোসেন হেসে বল্লে—ফটো নিয়ে কি হবে, যার জন্যে এত কষ্ট করে আসা—তার সন্ধান কর।

ইয়ার হোসেনের জনৈক মালয় অনুচর সেদিন দুপুরে একটা পাথরের বৃষমূর্ত্তি কুড়িয়ে পেলে গভীর বনের মধ্যে। খুব ছোট, কিন্তু অতটুকু মূর্ত্তির মধ্যেও শিল্পীর শিল্পকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় বর্ত্তমান।

রাত্রে জ্যোৎস্না উঠলো।

সুশীল তাঁবু থেকে একটু দূরে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর গিয়ে বসলো। ভাবতে ভাল লাগে এই সমুদ্রমেখলা দ্বীপময় রাজ্যের অতীত গৌরবের দিনের কাহিনী। রাত্রের যামঘোষী দুন্দুভি যেন বেজে উঠলো—ধারাযন্ত্রে স্নান সমাপ্ত করে কুঙ্কুমচন্দনলিপ্ত দেহে দিগ্বিজয়ী নৃপতি চলেছেন অন্তঃপুরের অভিমুখে, বারবিলাসিনীরা তাঁকে স্নান করিয়ে দিয়েছে এইমাত্র—তারাও ফিরচে তাঁর পিছনে পিছনে, কারো হাতে রজত কলস, কারো হাতে স্ফটিক কলস···

আধ-অন্ধকারে কালো মত কে একটা মানুষ বনের মধ্য থেকে বার হয়ে সুশীলের দিকে ছুটে এলো আততায়ীর মত— সুশীল চমকে উঠে একখানা পাথর ছুঁড়ে মারলে। মানুষটা পড়েই জানোয়ারের মত বিকট চীৎকার করে উঠলো—তারপর আবার উঠে আবার ছুটলো ওর দিকে। সুশীল ছুট দিলে তাঁবুর দিকে।

ওর চীৎকার শুনে তাঁবু থেকে সনৎ বেরিয়ে এল। ধাবমান জিনিসটাকে সে গুলি করলে। সেটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লে দেখা গেল সেটা একটা ওরাং ওটাং।

জামাতুল্লা ও ইয়ার হোসেন দু'জনে তিরস্কার করলে সুশীলকে।

এই বনে যেখানে সেখানে একা যাওয়া উচিত নয়, তারা কতবার বলবে একথা ? কত জানা অজানা বিপদ এখানে পদে পদে। পরদিন ছুতো করে সুশীল ও জামাতুল্লা আবার বেরিয়ে গেল বনের মধ্যে সেই গুহায়। সনৎকে সঙ্গে নিয়ে গেলনা। কেননা সকলে গেলে সন্দেহ করবে ওরা।

আবার সেই পরিশ্রম। আরও দুধাপ সিঁড়ি ও দুটো চাতাল ওরা ডিঙিয়ে গেল। দিন শেষ হয়ে গেল. সেদিন আর কাজ হয়না। আবার তার পরের দিন কাজ হোল সুরু। এইরকম আরও তিন চার দিন কেটে গেল।

একদিন সনৎ বল্লে—দাদা, তোমরা আর সেখানে দিন কতক যেও না।

সুশীল বল্লে—কেন ?

—ইয়ার হোসেন সন্দেহ করেচে। সে রোজ বলে, এরা বনের মধ্যে কি করে ? এত ফটো নেয় কিসের ?

—কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আর একদিনের কাজ বাকি। ওর শেষ না দেখে আমি আসতে পারচিনে।

—একা যাও—ছুজনে যেওনা। জোট বেঁধে গেলেই সন্দেহ করবে। হাতিয়ার নিয়ে যেও।

—তুই তাঁবুতে থেকে নজর রাখিস্ ওদের ওপর। কাল খুব সকালে আমি বেরিয়ে যাবো।

সুশীল তাই করলে। প্রায় ষাট ফুট নিচে তখন শেষ চাতাল নেমে গিয়েচে। সেদিন ছুপুর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করে সে চাতালটা ভেঙ্গে ফেল্লে।

তারপর যা দেখলে তাতে সুশীল একেবারে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও হতভম্ব হয়ে পড়লো।

সিড়ি গিয়ে শেষ হয়েচে ক্ষুদ্র একটী ভূগর্ভস্থ কক্ষে।

কক্ষের মধ্যে অন্ধকার সূচীভেদ্য।

টর্চ্চের আলোয় দেখা গেল কক্ষের ঠিক মাঝখানে একটী পাষাণবেদিকার ওপর এক পাষাণ নারীমূর্ত্তি—বিলাসবতী কোনো নর্ত্তকী যেন নাচতে নাচতে হঠাৎ বিটঙ্কবেদিকার ওপর পুত্তলিকার মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েচে কি দেখে।

এ কি !

এরজন্যে এত পরিশ্রম করে এরা এসব কাণ্ড করেচে !

সুশীল আরও অগ্রসর হয়ে দেখতে গেল।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ালো। পাথরের বেদীর ওপর সেই চিহ্ন আবার খোদাই করা। ঘরের মধ্যে টর্চ্চ ঘুরিয়ে দেখলে। তাকে ঘর বলা যেতে পারে, একটা বড় চৌবাচ্চাও বলা যেতে পারে। স্যাঁৎসেতে ছাদ স্যাঁৎসেতে মেঝে—পাতাল-পুরীর এই নিভৃত অন্ধকার গহ্বরে এ প্রস্তরময়ী নারীমূর্ত্তির রহস্য কে ভেদ করবে?

কিন্তু কি অদ্ভুত মূর্ত্তি! কটিতে চন্দ্রহার, গলদেশে মুক্তমালা প্রকোষ্ঠে মণিবলয়। চোখের চাহনি সজীব বলে ভ্রম হয়।

সেদিনও ফিরে গেল। জামাতুল্লাকে পরদিন সঙ্গে করে নিয়ে এল—তন্ন তন্ন করে চারিদিক খুঁজে দেখলে ঘরের, কোথাও কিছু নেই।

জামাতুল্লা বল্লে—কি মনে হয় বাবুজি?

—তোমার কি মনে হয়?

—এই সিঁড়ি আর চাতাল, চাতাল আর সিঁড়ি ষাটফুট গেঁথে মাটির নিচে শেষে এক নাচ্‌নেওয়ালীর পুতুল!

ছোঃ বাবুজি—এর মধ্যে আর কিছু আছে।

—বেশ কি আছে, বার করো। মাথা খাটাও।

তা তো খাটাবো—এদিকে ইয়ার হোসেনের দল যে খেপে উঠচে। কাল ওরা কি বলেচে জানেন?

—কি রকম?

—আর দুদিন ওরা দেখবে—তারপর নাকি এ দ্বীপ ছেড়ে

চলে যাবে। তা ছাড়া আর এক ব্যাপার। আপনাকেও ওরা সন্দেহ করে। বনের মধ্যে রোজ আপনি কি করেন? আমায় প্রায়ই জিগ্যেস করে।

—তুমি কি বল?

—আমি বলি বাবুজি ফটো তোলে, ছবি আঁকে। তাতে ওরা আপনাকে ঠাট্টা করে। ওসব মেয়েলী কাজ।

—যারা এই নগর গড়েছিল, পুতুল তৈরি করেছিল, পাথরে ছবি এঁকেছিল—তারা পুরুষমানুষ ছিল জামাতুল্লা। ইয়ার হোসেনের চেয়ে অনেক বড় পুরুষছিল—বলে দিও তাকে।

সুশীলকে রেখে জামাতুল্লা ফিরে যেতে চাইলে। নতুবা ইয়ার হোসেনের দল সন্দেহ করবে। যাবার সময় সুশীল বল্লে—কোনো উপায়ে এখানে একটা আলোর ব্যবস্থা করতে পারো? টর্চ্চ জ্বালিয়ে কতক্ষণ থাকা যায়? আর কিছু না থাকে সাপের ভয়ও তো আছে।

জামাতুলা বল্লে—আমি এক্ষুনি ফিরে আসচি লণ্ঠন নিয়ে বাবুজি। আপনি ওপরে উঠে বসুন, এ পাতালের মধ্যে একা থাকবেন না—

সুশীল বল্লে—না, তুমি যাও—আমি এখানেই থাকবো। পকেটে একটুকরো মোমবাতি এনেচি—তাই জ্বালাবো।

একা একটুকরো বাতি জ্বালিয়ে সুশীল ঘরটার মধ্যে বসে ভাবতে লাগলো। বাইরে এত বড় রাজ্য যারা প্রতিষ্ঠা করেছিল, কোন জিনিষ গোপন করবার জন্যে তারা এই পাতালপুরী তৈরি

করেছিল এত কষ্ট স্বীকার করে—নর্ত্তকী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে নয় নিশ্চয়।

হঠাৎ নর্ত্তকীর পুতুলটার দিকে ওর দৃষ্টি পড়াতে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কি ব্যাপার এটা ?

এতক্ষণ মূর্ত্তিটার যতখানি তার দিকে ছিল, সেটা যেন সামান্য একটু পাক খেয়ে খানিকটা ঘুরে দাঁড়িয়েচে।

সুশীল চোখ মুছে আবার চাইলে।

হাঁ, সত্যিই তাই। এই বাতিটার সামনে ছিল ওই পা খানা—এখন পায়ের হাঁটুর পেছনের অংশ দেখা যায় কি করে ? সে তো এতটুকু নড়েনি নিজে, যেখানে সেখানেই বসে আছে।

সুশীলের ভয় হোল। শ্মশানপুরীর ভূগর্ভস্থ কক্ষ, কত শতাব্দীর পুঞ্জীভূত দৈত্যদানোর দল জমা হয়ে আছে এ সব জায়গায় কে বলতে পারে ? কিসে মৃত্যু আর কিসে জীবন, এ বার্ত্তা পৌঁছে দেবার লোক নেই। সরে পড়াই ভালো।

এমন সময় ওপর থেকে লণ্ঠনের আলো এসে পড়লো, পায়ের শব্দ শোনা গেল। জামাতুল্লা লণ্ঠন নিয়ে ঘরের মধ্যে ওপর থেকে উঁকি মেরে বল্লে—বাবুজি, ঠিক আছেন ?

—তা আছি। ঘরের মধ্যে নামো জামাতুল্লা—

জামাতুল্লা ঘরের মেজেতে নেমে ওর পাশে দাঁড়ালো। সুশীল ওকে মূর্ত্তির ব্যাপারটা দেখিয়ে বল্লে—এখন তুমি কি মনে কর ?

—কিছু বুঝতে পারছি নে বাবুজি—খুব তাজ্জব কথা।

—তুমি থাকো এখানে—বোসো—

কিন্তু জামাতুল্লা দাঁড়ালো না। দুজনে এখানে বসে থাকলে ইয়ার হোসেনের দলের সন্দেহ ঘোরালো রকম হয়ে উঠবে, সে থাকতে পারবে না। জামাতুল্লা চলে যাবার পরে সুশীল অনেকক্ষণ মূর্ত্তিটার দিকে চেয়ে বসে রইল। মূর্ত্তিটা এবার বেশ ঘুরে গিয়েচে, এ সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। ওর আগের ভয়ের ভাবটা কেটে গিয়েছিল জামাতুল্লা, লণ্ঠন নিয়ে আসবার পর থেকে, এখন ভয়ের চেয়ে কৌতুহল বেশি।

খুব একটু একটু করে ঘুরচে, ঘূর্ণ্যমান রঙ্গমঞ্চের মতই, মূর্ত্তির পদতলস্থ বিটঙ্ক বেদিকা।

কেন? কি উদ্দেশ্যে? অতীত শতাব্দীগুলো মূক হয়ে রইল, এর জবাব মেলে না। বেলা গড়িয়ে এল, সুশীলের হাতঘড়িতে বাজে পাঁচটা।

হঠাৎ সুশীল চেয়ে দেখলে আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার। নর্ত্তকী মূর্ত্তির সরু সরু আঙ্গুলগুলির মধ্যে একটা আঙ্‌ুল একটি বিশেষ মুদ্রা রচনা করার দরুণ অন্য সব আঙ্‌ুল থেকে পৃথক এবং একদিকে কি যেন নির্দ্দেশ করার ভঙ্গিতে ছিল। এবার যেন আঙ্‌ুলের ছায়া পড়েচে দেওয়ালের এক বিশেষ স্থানে।

এমন ভঙ্গিতে পড়েচে যেন মনে হয় মূর্ত্তিটী তর্জ্জনী-অঙ্গুলির দ্বারা ভিত্তি গাত্রের একটী স্থান নির্দ্দেশ করচে।

তখনি একটা কথা মনে হোল সুশীলের। লণ্ঠনের আলোর দ্বারা এ ছায়া তৈরী হয়েচে, না কোনো গুপ্ত ছিদ্রপথে দিবালোক প্রবেশ করেচে ঘরের মধ্যে ?

তাই বলে মনে হয়, কৃত্রিম লণ্ঠনের আলোর কৃত্রিম ছায়া এ নয়। ও লণ্ঠনের আলো কমিয়ে দিয়ে দেখলে—তখন অস্পষ্ট আলো অন্ধকারের মধ্যেও তর্জ্জনীর ছায়া ভিত্তি গাত্রে পড়ে একটা স্থান যেন নির্দ্দেশ করচে।

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে ও উঠে জায়গাটা দেখতে গেল।

দেওয়ালের সেই জায়গা একেবারে সমতল, চিহ্নহীন—চারিপাশের অংশের সঙ্গে পৃথক করে নেওয়ার মত কিছুই নেই সেখানে। তবুও সে নিরাশ না হয়ে দেওয়ালের সেই জায়গাটাতে হাত বুলিয়ে দেখতে গেল।

হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটলো। ঠিক যেখানে আঙুলের অগ্রভাগ শেষ হয়েচে সেই স্থানের খানিকটা যেন বসে গেল—অর্থাৎ ঢুকে গেল ভেতরের দিকে। একটা শব্দ হোল পেছনের দিকে—ও পেছন ফিরে চেয়ে দেখলে বিটঙ্ক বেদিকার তলাটা যেন ঈষৎ ফাঁক হয়ে গিয়েচে।

ও ফিরে এসে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলে গোলাকার বেদিকাটি তার নর্ত্তকী মূর্ত্তিটা শুদ্ধ যেন একটা পাথরের ছিপি। বড় বোতলের মুখে যেমন কাঁচের ষ্টপার বা ছিপি থাকে, এ যেন পাষাণ নির্ম্মিত বিরাট এক ষ্টপার। কিসের চাড় লেগে ষ্টপারের মুখ ফাঁক হয়ে গিয়েচে।

ও নর্ত্তকী মূর্ত্তির পাদদেশ ও গ্রীবায় তুখহাত দিয়ে মূর্ত্তিটাকে একটু ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা কর্ত্তেই সেটা সবশুদ্ধ বেশ আস্তে আস্তে ঘুরতে লাগলো। কয়েক বার ঘুরবার পরেই ক্রমেই তার তলায় ফাঁক, চওড়া হয়ে আসতে লাগলো। কি কৌশলে প্রাচীন শিল্পী পাথরের উপরটাকে ঘুর্ণ্যমান করে তৈরী করেছিল ?

এই মূর্ত্তিশুদ্ধ বেদিকা টেনে তোলা তার একার সাধ্যে কুলুবে না। জামাতুল্লা ও সনৎ তুজনকেই আনতে হবে কোনো কৌশলে সঙ্গে করে, ইয়ার হোসেনের দলের অগোচরে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার বিলম্ব নেই। বহু দিন রাত্রির ছায়া অতীতের এ নিস্তব্দ কক্ষে জীবনের সুর ধ্বনিত করেনি, এখানে গভীর নিশীথ রাত্রির রহস্য হয়তো মানুষের পক্ষে খুব আনন্দদায়ক হবে না, মানুষের জগতের বাইরে এরা।

সুশীল লণ্ঠন হাতে উঠে এল আঁধার পাতালপুরীর কক্ষ থেকে। তাঁবুতে ঢুকবার পথে ইয়ার হোসেন বড় ছুরি দিয়ে পাখীর মাংস ছাড়াচ্ছে।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বল্লে—কোথায় ছিলে ?

—ছবি আঁকতে মিঃ হোসেন।

—লণ্ঠন কেন ?

—পাছে রাত হয়ে যায় ফিরতে। বনের মধ্যে আলো থাকলে অনেক ভালো।

—এত ছবি এঁকে কি হয় বাবু ?

—ভালো লাগে।

—আসল ব্যাপারের কি? জামাতুল্লা আমাদের ফাঁকি দিয়েচে। আমি ওকে মজা দেখিয়ে দেবো।

—আমরা সকলেই চেষ্টা করচি। ব্যস্ত হবেন না মিঃ হোসেন—

—আমি আর পাঁচ দিন দেখবো। তারপর এখান থেকে চলে যাবো—কিন্তু যাবার আগে জামাতুল্লাকে দেখিয়ে যাবো সে কার সঙ্গে জুয়োচুরি করতে এসেছিল।

—জামাতুল্লার কি দোষ? আপনি বরং আমাকে দোষ দিতে পারেন—

—আরে আপনি তো ছবি আঁকিয়ে পুরুষ মানুষ। এসব কাজ আপনার না।

সুশীল রাত্রে চুপি চুপি ওদের নর্ত্তকী পুতুলের ঘটনা সব বল্লে। ওদের দুজনকেই যেতে হবে, নতুবা ছিপি উঠবে না।

জামাতুল্লা বল্লে—কিন্তু আমাদের দুজনের একসঙ্গে যাওয়া সম্ভব নয় বাবুজি।

—কেন?

—জানেন না এর মধ্যে নানারকম ষড়যন্ত্র চলচে। ওরা আপনাদের চেয়ে আমাকেই দোষ দেবে বেশি। আপনাকে ওরা নিরীহ, গোবেচারী বলে ভাবে—

—সেটা অন্যায়।

—আপনারা ভাল মানুষ, আমার হাতের পুতুল—পুতুল যেমন নাচায়, তেমনি আপনারা আমার হাতে—

শেষের কথাটা শুনে সুশীলের আবার মনে পড়লো নর্ত্তকী মূর্ত্তির কথা। কাল হয়তো বেরুনো যাবে না, ইয়ার হোসেনের কড়া নজর বন্দীর দরুণ। আজই রাত্রে অন্য দল ঘুমুলে সেখানে গেলে ক্ষতি কি ?

সনৎকে বল্লে—সনৎ তৈরী হও। আজ রাত্রে হয় আমাদের জীবন, নয়তো আমাদের মরণ। পাতালপুরীর রহস্য আজ ভেদ করতেই হবে। আজ আঁধার রাত্রে চুপি চুপি বেরুবি আমার সঙ্গে—দিনের আলোয় সব ফাঁস হয়ে যাবে।

জামাতুল্লা বল্লে—কেউ টের না পায় বাবুজি, জুতো হাতে করে সব যাবে কিন্তু।

আহারাদির পর্ব্ব মিটে গেল। দাবানল জ্বলে উঠেছে আজ ওদের মনে, বনের সাময়িক দাবানলকেও ছাপিয়ে তার শিখা সমস্ত মনের আকাশ ব্যেপে বেড়ে উঠলো।

দুটো রাইফেল, একটা রিভলভার, একটা শাবল, একটা গাঁতি, খানিকটা দড়ি, চার পাঁচটা মোমবাতি, কিছু খাবার জল এক শিশি টিংচার আইডিন, খান কতক মোটা রুটি—তিনজনের মধ্যে এগুলো ভাগ করে নিয়ে রাত একটার পর ওরা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তাঁবু থেকে বেরুলো।

ইয়ার হোসেনের একজন মালয় অনুচর উল্টোমুখে দাঁড়িয়ে 'বোলো' (রামদাও) হাতে পাহারা দিচ্চে। অন্ধকারে এরা বুকে ঘেঁসে চলে এল···সে লোকটা টের পেলে না।

সনৎ বল্লে—আমি সে পুতুলটা একবার দেখবো—

অদ্ভূত রাত্রি! বনের মাথায় মাথায় অগণিত তারা, বহুকালের সুপ্ত নগরীর রহস্যে নিশীথরাত্রির অন্ধকার যেন থম্ থম্ করচে, সমস্ত ধ্বংসস্তূপটা যেন মূহূর্ত্তে সহর হয়ে উঠতে পারে—ওর অগণিত নরনারী নিয়ে। লতাপাতা, ঝোপ ঝাপ মহীরুহের দল খাড়া হয়ে সেই পরম মূহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় যেন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করচে।

অন্ধকারে একটা সর সর শব্দ হতে লাগলো সামনের মাটিতে।

সকলে থমকে দাঁড়ালো হঠাৎ। সনৎ ও সুশীল একসঙ্গে টর্চ্চ টিপলে—প্রকাণ্ড একটা অজগর সাপ আস্তে আস্তে ওদের পাঁচ হাত তফাৎ দিয়ে চলে যাচ্ছে। সকলে পাথরের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল, সাপটা বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর ওরা আবার চললো।

গহ্বরের মুখ—ওরা লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রেখে গিয়েছিল। তিনজনে মিলে সেগুলো সরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগলো।

সনৎ বল্লে—এতো বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখছি—

কিন্তু পাতালপুরীর কক্ষের সে নর্ত্তকী মূর্ত্তিটা দেখে ওর মুখে কথা সরলো না। শিল্পীর অদ্ভূত শিল্পকৌশলের সামনে ও যেন হতভম্ব হয়ে গেল।

সুশীল বল্লে—শুধু এই মূর্ত্তিটি কিউরিও হিসাবে বিক্রী

করলে দশহাজার টাকা যে কোনো বড় সহরের মিউজিয়ম কিনে নেবে—তবে আমাদের দেশে নয়—ইউরোপে।

জামাতুল্লা বল্লে—ধরুন বাবুজি, নাচনেওয়ালী পুতুলটা সবাই মিলে—পাক খাওয়াতে হবে একে বার কয়েক এখনও।

মিনিট দুই সবাই মিলে পাক দিয়ে মূর্ত্তিটাকে ঘোরালো যেমন ষ্টপার ঘোরায় বোতলের মুখে। তারপর সবাই সন্তর্পণে মূর্ত্তিটাকে ধরে উঠিয়ে নিলে। ষ্টপারের মতই সেটা খুলে এল।

সঙ্গে সঙ্গে বিটঙ্কবেদীর নীচের অংশে বার হয়ে পড়লো গোলাকার একটা পাথরের চৌবাচ্চা। সুশীল উঁকি মেরে দেখে বল্লে—টর্চ্চ ধরো, খুব গভীর বলে মনে হচ্চে—

টর্চ্চ ধরে ওরা দেখলে চৌবাচ্চা অন্ততঃ সাত ফুট গভীর। তার তলায় কি আছে না আছে ওপর থেকে ভাল দেখা যায় না।

সনৎ বল্লে—আমি লাফ দিয়ে পড়বো দাদা ?

জামাতুল্লা বারণ করলে—এ সব পুরোণো কূপের মধ্যে বিষধর সর্প প্রায়ই বাসা বাঁধে, যাওয়া সমীচীন হবে না।

দু একটী পাথর ছুঁড়ে মেরে ওরা দেখলে, কোনো সাড়াশব্দ এল না আধ অন্ধকার কূপের মধ্য থেকে। তখন জামাতুল্লাই ধুপ করে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো ওর মধ্যে।

কিছুক্ষণ তার আর কোনো সাড়া নেই।

সুশীল ও সনৎ অধীর কৌতূহলের সঙ্গে বলে উঠলো—কি, কি,—কি দেখলে ?

তবুও জামাতুল্লার মুখে কথা নেই। সে যেন কি হাতড়ে বেড়াচ্ছে চৌবাচ্চার তলায়। একটু অদ্ভুত ভাবে হাতড়াচ্ছে—একবার সামনে যাচ্ছে, আবার পিছু হঠে আসচে।

সুশীল বল্লে—কি হোল হে? পেলে কিছু দেখতে?

জামাতুল্লা বল্লে—বাবুজি, এর মধ্যে কিছু নেই—

—কিছু নেই!

—না বাবুজি। একেবারে ফাঁকা—

—তবে তুমি ওর মধ্যে কি করচো জামাতুল্লা?

—এর মধ্যে একটা মজার ব্যাপার আছে। নেমে এসে দেখুন—

সুশীল ও সনৎ সন্তর্পনে একে একে পাথরের চৌবাচ্চাটার মধ্যে লাফিয়ে পড়লো। জামাতুল্লা দেখালে—এই দেখুন বাবুজি, এই লাইন ধরে একবার সামনে, একবার পিছনে গিয়ে দেখুন—তা হোলেই বুঝতে পারবেন—

সামনে পেছনে গিয়ে কি হবে?

সুশীল লক্ষ্য করে দেখলে চৌবাচ্চার ডান দিকের দেওয়ালে একটা কালো রেখা আছে, সেইটে ধরে যদি সামনে বা পেছনে যাওয়া যায় তবে চৌবাচ্চার তলাটা একবার নামে, একবার ওঠে। ছেলেদের 'see-saw' খেলার তক্তাটার মত।

সনৎ বল্লে—ব্যাপারটা কি?

সুশীল বল্লে—অর্থাৎ এটা যদি কোনোরকমে ওঠানো যায়,

তবে এর মধ্যে আর কিছু রহস্য আছে। কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব বুঝতে পারা যাচ্চে না।

জামাতুল্লা বল্লে—বাবু, গাঁতি দিয়ে তলা ভেঙে ফেলতে পারি তো—অন্য কোনো পথ যদি না পাওয়া যায়। কিন্তু আজ থাকলে হোত না বাবুজি? বড্ড দেরী হয়ে গেল আজ—সকাল হয় হয়—

হঠাৎ সুশীল চৌবাচ্চার একজায়গায় টর্চ্চের আলো ফেলে বলে উঠলো—এই ছাখো সেই চিহ্ন—

সনৎ ও জামাতুল্লা সবিস্ময়ে দেখলে চৌবাচ্চার কালো রেখার ওপরে উত্তর দিকের কোণে, ছ'খানা পাথরের সংযোগস্থলে তাদের অতি পরিচিত সেই চিহ্নটি আঁকা।

সুশীল বল্লে—হদিস্ পেয়েচি বলে মনে হচ্চে—

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ এই চিহ্নর ওপর টিপলেই চৌবাচ্চার তলার পাথর খানা একদিকে খুব বেশি কাৎ হয়ে, ভেতরে কি আছে দেখিয়ে দেবে। কিন্তু আজ বড্ড বেলা হয়ে গেল। আজ থাক, চলো!

জামাতুল্লাও তাতে মত দিলে। সবাই মিলে তাঁবুতে ফিরে এল যখন, তখনও ভোরের আলো ভাল করে ফোটেনি। ইয়ার হোসেনের মালয় ভৃত্য 'বোলো' হাতে তাঁবুর দ্বারে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে আছে। জামাতুল্লার ইঙ্গিতে সুশীল ও সনৎ উপুড় হয়ে পড়ে বুকে হেঁটে নিজেদের তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়লো।

জামাতুল্লা বল্লে—ঘুমিয়ে পড়ুন বাবুজিরা—কিন্তু বেশি বেলা পর্য্যন্ত ঘুমুবেন না, আমি উঠিয়ে দেবো সকালেই। নইলে ওরা সন্দেহ করবে।

সুশীল বল্লে—আমাদের অবর্ত্তমানে ওরা ঘরে ঢোকেনি এই রক্ষে—

সনৎ অবাক হয়ে বল্লে—কি করে জানলে দাদা?

—দেখবে? এই দেখো। তাঁবুর দোরে শাদা বালি ছড়ানো, যে কেউ এলে পায়ের দাগ পড়তো। তা পড়েনি।

ওরা যে যার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

সুশীলকে কে বল্লে—আমার সঙ্গে আয়।

গভীর অন্ধকারের মধ্যে এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষের পিছু পিছু ও গভীর বনের কতদূর চললো। ইয়ার হোসেনের মালয় ভৃত্যগণ ঘোর তন্দ্রাভিভূত, উষার আলোকের ক্ষীণ আভাসও দেখা যায় না পূর্ব্ব দিগন্তে, বৃক্ষলতা স্তব্ধ, স্বপ্নঘোরে আচ্ছন্ন। সারি সারি প্রাসাদ একদিকে, অন্যদিকে প্রশস্ত দীর্ঘিকার টলটলে নির্ম্মল, জলরাশির বুকে পদ্ম ফুল ফুটে আছে। সেই গভীর বনে, গভীর অন্ধকারের মধ্যে দেউলে দেউলে ত্রিমুর্ত্তি মহাদেবের পূজা হচ্ছে। সুগন্ধ দীপবর্ত্তিকার আলোকে মন্দিরাভ্যন্তর আলোকিত। প্রাসাদের বাতায়ন বলভিতে শুকসারী তন্দ্রামগ্ন।

সুশীল বল্লে—আমায় কোথায় নিয়ে যাবেন?

—সে কথা বলবো না। ভয় পাবি—

—তবুও শুনি, বলুন—

—বহুদিনের বহু ধ্বংস, অভিশাপ, মৃত্যুর দীর্ঘশ্বাসে এ পুরীর বাতাস বিষাক্ত। এখানে প্রবেশ করবার দুঃসাহসের প্রশংসা করি। কিন্তু এর মূল্য দিতে হবে।

—কি ?

—একজনের প্রাণ। সমুদ্রমেখলা এ দ্বীপের বহু শতাব্দীর গুপ্ত কথা ঘন বনে ঢেকে রেখেছিল। ভারত মহাসমুদ্র স্বয়ং এর প্রহরী, দেখতে পাও না ?

—আজ্ঞে, তা দেখ্‌চি বটে।

—তবে সে রহস্য ভেদ করতে এসেছ কেন ?

—আপনি তো জানেন সব।

—সম্রাটের ঐশ্বর্য্য গুপ্ত আছে এর মধ্যে। কিন্তু সে পাবে না। যে অদৃশ্য আত্মারা তা পাহারা দিচ্চে, তারা অত্যন্ত সতর্ক, অত্যন্ত হিংসুক। কাউকে তারা নিতে দেবে না তবে তুমি ভারতবর্ষের সন্তান, তোমাকে একেবারে বঞ্চিত করবো না আমি। রহস্য নিয়ে যাও, অর্থ পাবে না। যা পাবে তা সামান্য। তারই জন্যে প্রাণ দিতে হবে।

—আপনি কি বিন্ধমুনি ?

—মুর্খ আমি এই নগরীর অধিদেবতা, ধ্বংসস্তূপ পাহারা দিচ্চি শতাব্দীর পর শতাব্দী। অনেকদিন পরে তুমি ভারতবর্ষ থেকে এসেচো—আটশো বছর আগে তোমাদের সাহসী পূর্ব্বপুরুষরা অস্ত্র হাতে এখানে এসে রাজ্যস্থাপন করেন।

দুর্ব্বল হাতে তাঁরা খড়্গ ধরতেন না। তোমরা সেদেশ থেকেই এসেচ কি? দেখলে চেনা যায় না কেন?

—সেটা আমাদের অদৃষ্টের দোষ, আমাদের ভাগ্যলিপি।

তারপরেই সব অন্ধকার। সুশীল সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব পুরুষের সঙ্গে সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন চলেচে··· চলেচে···মাথার ওপর কৃষ্ণা নিশীথিনীর জ্বলজ্বলে নক্ষত্রভরা আকাশ।

পুরুষটি বল্লেন—সাহস আছে? তুমি ভারতবর্ষের সন্তান—

—নিশ্চয়ই, দেব।

নগরী বহুদিন মৃতা, কিন্তু বহু যুগের পুরাতন কৃষ্ণাগুরুর ধূপগন্ধে আমোদিত অরণ্যতরুর ছায়ায় ছায়ায় অজানা পথযাত্রার যেন শেষ নাই।

বিশাল পুরী প্রেতপুরীর সমান নিস্তব্ধ। রাজপ্রাসাদের বিস্তৃত কক্ষে, দামী নীলাংশুকের আস্তরনে ঢাকা স্বর্ণ পর্য্যঙ্ক কোন্ অপরিচিতের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত। সুশীলের বুক গুরুগুরুকরে উঠলো, গৃহের রত্নপ্রস্তরের ভিত্তিতে যেন অমঙ্গলের লেখা ভবনদর্শনে প্রতিফলিত হয়ে উঠবে এখনি যেন কোন্ বিভীষণা অপদেবীর বিরাট মূর্ত্তি!

পুরুষ বল্লেন—ঐ শোনো—

সুশীল চমকে উঠলো। যেন কোন্ নারীকণ্ঠের শোকার্ত্ত চীৎকারে নিশীথ নগরীর নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল। সে নারীর কণ্ঠস্বরকে সে চেনে। অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠস্বরন খুব নিকট

আত্মীয়ার বিলাপধ্বনি। সুশীলের বুক কেঁপে উঠলো! ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে কে ডাকলে— বাবুজি—বাবুজি—

তার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা ঘামে ভেসে গিয়েচে। জামাতুল্লা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকচে। দিনের আলো ছুটেচে তাঁবুর বাইরে।

জামাতুল্লা বল্লে—উঠুন বাবুজি।

সুশীল বিমূঢ়ের মত বল্লে—কেন ?

—ভোর হয়েচে; ইয়ার হোসেনের লোক এখনও ওঠেনি—আমাদের কেউ কোনো সন্দেহ না করে। সনৎবাবুকে ওঠাই—

একটু বেলা হোলে ইয়ার হোসেন উঠে ওদের ডাকালে। বল্লে—পরশু এখান থেকে তাঁবু ওঠাতে হবে। জাঙ্ক্‌ওয়ালা চীনেম্যান আমার নিজের লোক। ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেচে। আর থাকতে চাইচে না। এখানে আপনারা এলেন ফটো তুলতে আর ছবি আঁকতে। এত পয়সা খরচ এর জন্যে করিনি।

সুশীল বল্লে—যা ভাল বোঝেন মিঃ হোসেন।

সনৎ বল্লে—তা হোলে দাদা, আমাদের সেই কাজটা এই দুদিনের মধ্যে সারতে হবে—

ইয়ার হোসেন সন্দেহের সুরে বল্লে—কি কাজ ?

সুশীল বল্লে, বনের মধ্যে একটা মন্দিরের গায়ে পাথরের ছবি আছে, সেটা আমি আঁকচি। সনৎ ফটো নিচ্চে তার।

ইয়ার হোসেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বল্লে—ওই করতেই আপনারা এসেছিলেন আর কি! করুন যা হয় এই দুদিন।

সনৎ বল্লে তা হোলে চল দাদা আমরা সকাল সকাল খেয়ে রওনা হই।

ইয়ার হোসেনের অনুমতি পেয়ে ওদের সাহস বেড়ে গেল। দিন দুপুরেই ওরা দুজন রওনা হয়ে গেল—সাবল, গাঁতি টর্চ্চ ওরা কিছুই আনে নি, সিঁড়ির মুখের প্রথম ধাপে রেখে এসেচে। শুধু ক্যামেরা আর রিভলভার হাতে বেরিয়ে গেল।

জামাতুল্লা গোপনে বল্লে—আমি কোনো ছুতোয় এর পরে যাবো। একসঙ্গে সকলে গেলে চালাক ইয়ার হোসেন সন্দেহ করবে। আজ কাজ শেষ করতে হবে মনে থাকে যেন, হয় এস্পার নয় তো ওস্পার। আর সময় পাবো না।

সনৎ বল্লে—মনে থাকে যেন একথা। আজ আর ফিরবো না শেষ না দেখে।

সুশীলের বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠলো সনতের কথায়। সনতের মুখের দিকে ও চাইলে। কেন সনৎ হঠাৎ এ কথা বল্লে?

আবার সেই অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে রহস্যময় গহ্বরে সুশীল ও সনৎ এসে দাঁড়ালো। আসবার সময় সিঁড়ির প্রথম ধাপে থেকে ওরা গাঁতি ও টর্চ্চ নিয়ে এসেচে। পাথরের নর্ত্তকীমূর্ত্তি দেওয়ালের গায়ে এক জায়গায় কাৎ করে রাখা হয়েচে। যেন জীয়ন্ত পরী দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েচে মনে হয়। সুশীল সেদিকে চেয়ে বল্লে—আর কিছু না পাই, এই পুতুলটা

নিয়ে যাবো। সব খরচ উঠে এসেও অনেক টাকা লাভ থাকবে শুধু ওটা বিক্রী করলে।

তার পর তুজনে নীচের পাথরের চৌবাচ্চাটাতে নামলো।

সনৎ বল্লে—উত্তর কোণের গায়ে চিহ্নটা দেখতে পাচ্চ দাদা?

এখন কিছু কেরো না জামাতুল্লাকে আসতে দাও

সনৎ ছেলেমানুষ, সে সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে জন্মগ্রহণ করে একদিন যে জীবনে এমন একটা রহস্যসঙ্কুল পথযাত্রায় বেরিয়ে পড়বে, কবে সে একথা ভেবেছিল? সুশীল কিন্তু বসে বসে অন্যকথা ভাবছিল।

গত রাত্রের স্বপ্নের কথা তার স্পষ্ট মনে নেই, আবছায়া ভাবে যতটুকু মনে আছে, সে যেন গত রাত্রে এক অদ্ভুত রহস্য-পুরীর পথে পথে কার সঙ্গে অনির্দ্দেশ যাত্রায় বার হয়েছিল, কত কথা যেন সে বলেছিল, সব কথা মনে হয় না। তবুও যেন কি এক অমঙ্গলের বার্ত্তা সে জানিয়ে দিয়ে গিয়েচে, কি সে বার্ত্তা, কার সে অমঙ্গল কিছুই স্পষ্ট মনে নেই—অথচ সুশীলের মন ভার ভার, আর যেন তার উৎসাহ নেই এ কাজে ফিরবার পথও তো নেই।

ওপরের ঘর থেকে জামাতুল্লা উঁকি মেরে বল্লে—সব ঠিক?

—এসেচ?

—হাঁ বাবুজি। অনেকটা দড়ি এনেচি লুকিয়ে—

—নেমে পড়।

—আপনারা ক্যামেরা এনেচেন?

—কেন বলতো ?

—ইয়ার হোসেনকে ফাঁকি দিতে হোলে। ক্যামারাতে ফটো তুলে নিয়ে যেতে হবে—

—সব ঠিক আছে।

জামাতুল্লা ওদের সঙ্গে এসে যোগ দেবার অল্পক্ষণ পরেই সনৎ হঠাৎ কি ভেবে দেওয়ালের উত্তর কোণের সে চিহ্নটা চেপে ধরলে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাথরের চৌবাচ্চার তলা একদিকে উঁচু হয়ে উঠতেই ফাঁক দিয়ে সনৎ নীচের দিকের অতলস্পর্শ অন্ধকারে লাফিয়ে পড়লো।

সুশীল ও জামাতুল্লা দুজনেই চমকে চীৎকার করে উঠলো। অমন অতর্কিত ভাবে সনৎ লাফ মারতে গেল কেন, ওরা ভেবে পেলে না।

কিন্তু লাফ মারলে কোথায় ?

জামাতুল্লা সভয়ে বল্লে—সর্ব্বনাশ হয়ে গেল বাবুজি !

তারপর ওরা দুজনেই কিছু না ভেবেই পাথরের চৌবাচ্চার তলার ফাঁক দিয়ে লাফ দিয়ে পড়লো।

ওরা ঘোর অন্ধকারের মধ্যে নিজেদের দেখতে পেলে।

সনৎ অন্ধকারের ভেতর থেকেই বলে উঠলো—দাদা, টর্চ্চ জ্বালুন আগে, জায়গাটা কি রকম দেখতে হবে—

ওরা টর্চ্চ জ্বেলে চারিদিক দেখে অবাক হয়ে গেল। ওরা একটা গোলাকার ঘরের মধ্যে নিজেদের দেখতে পেলে—ঘরের দু-কোণে দু'টো বড় পয়োনালি মত কেন রয়েচে ওরা বুঝতে

পারলে না। ছাদের যে জায়গায় কড়িকাঠের অগ্রভাগ দেওয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবার কথা, সেখানে দুটো বড় বড় পাথরের গাঁথুনি পয়োনালি, একটা এদিকে, আর একটা ওদিকে। সমস্ত ঘরটায় জলের দাগ, মেঝে ভয়ানক ভিজে ও স্যাঁৎসেঁতে, যেন কিছুক্ষণ আগে এঘরে অনেকখানি জল ছিল।

জামাতুল্লা বল্লে—এ ঘরে এত জল আসে কোথা থেকে বাবুজি ?

সুশীল কিছু বলতে পারলে না। প্রকাণ্ড ঘর, অন্ধকারের মধ্যে ঘরের কোথায় কি আছে ভাল বোঝা যায় না।

সনৎ বল্লে—ঘরের কোণ গুলো অন্ধকার দেখাচ্চে, ওদিকে কি আছে দেখা যাক—

টর্চ্চ ধরে তিন জনে ঘরের একদিকের কোণে গিয়ে দেখে অবাক চোখে ওরা চেয়ে রইল।

ঘরের কোণে বড় বড় তামার জালা বা ঘড়ার মত জিনিস, একটার ওপর আর একটা বসানো, ঘরের ছাদ পর্য্যন্ত উঁচু, সেদিকের দেওয়ালের গা দেখা যায় না—সমস্ত দেওয়াল ঘেঁসে সেই ধরণের রাশি রাশি তামার জালা—ওরা এতক্ষণ ভাল করে দেখেনি, সেই তামার জালার রাশিই অন্ধকারে দেওয়ালের মত দেখাচ্ছিল।

জামাতুল্লা বল্লে—এগুলো কি বাবুজি ?

সুশীল বল্লে—আমার মনে হয় এটাই ধনভাণ্ডার।

সনৎ বল্লে—আমরা ঠিক জায়গায় পৌঁছে গিয়েচি—

জামাতুল্লা হঠাৎ অন্য দেয়ালের দিকে গিয়ে বল্লে—এই দেখুন বাবুজী—

সেদিকে দেয়ালের সাথে বড় বড় কুলুঙ্গির মত অসংখ্য গর্ত্ত প্রত্যেকটার মধ্যে ছোট বড় কৌটার মত কি সব জিনিস।

সুশীল বল্লে—যাতে তাতে হাত দিও না, এ সব পাতাল-ঘরে সাপ থাকা বিচিত্র নয়। এই ঘোর অন্ধকারে পাতালপুরী বিষাক্ত সাপের রাজ্য হওয়াই বেশি সম্ভব।

কিন্তু চারিদিক ভাল করে টর্চ্চ ফেলে দেখেও সাপের সন্ধান পাওয়া গেল না।

সনৎ ও জামাতুল্লা কুলুঙ্গি থেকে একটা কৌটা বার করে দেখলে। ভেতরে যা আছে তা দেখে ওরা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলো না। এ কি সম্ভব এত বড় একটা-প্রাচীন সাম্রাজ্যের গুপ্ত ধনভাণ্ডারে এত কাণ্ড করে পাতালের মধ্যে ঘর খুঁড়ে তাতে পুরোণো হর্ত্তুকি রাখা হবে?

ওদের হতভম্ব মুখের চেহারা দেখে সুশীল বল্লে—কি ওর মধ্যে?

সনৎ বল্লে—পুরোণো হর্ত্তুকি দাদা—

—দূর পাগল—হর্ত্তুকি কি রে?

—এই দেখুন—

সুশীল গোল গোল ছোট ফলের মত জিনিস হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে বল্লে—আমি জানি নে এ কি জিনিস, কিন্তু যখন এত

যত্ন করে একে রাখা হয়েচে, তখন এর দাম আছে। থলের মধ্যে নাও দুএক বাক্স—

সব কৌটাগুলোর মধ্যেই সেই পুরোণো হর্ত্তুকি।

ওরা দস্তুর মত হতাশ হয়ে পড়লো। এত কষ্ট করে পুরোণো হর্ত্তুকি সংগ্রহ করতে ওরা এতদূর আসে নি।

হঠাৎ সুশীল বলে উঠলো—আমার একটা কথা মনে হয়েচে—

সনৎ বল্লে—কি দাদা ?

—এ জিনিস যাই হোক, এই ছিল পুরোণো সাম্রাজ্যের প্রচলিত মুদ্রা—কারেন্সি—এই আমার স্থির বিশ্বাস। সঙ্গে নাও কিছু পুরোণো হর্ত্তুকি—

জামাতুল্লা অনেক কৌশল করে একটা তামার জালা পাড়লে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তার মুখের ঢাক্‌নি খোলা গেল না। জামাতুল্লা বিরক্ত হয়ে বল্লে—এ কি রিবিট্ করে এঁটে দেওয়া বাবুজি, এ খুলবার হদিস্ পাচ্চি নে যে—

টানাটানি করতে গিয়ে একটা ঢাক্‌নি খটাং করে খুলে গেল।

সনৎ বল্লে—দেখো ওর মধ্যে থেকে আবার পুরোণো আমলকী না বার হয় দাদা—

কিন্তু জালাটা উপুড় করে ঢাললে তার মধ্যে থেকে বেরুলো রাশি রাশি নানা রং বেরংয়ের পাথর। দামী জিনিস বলে মনে হয় না! সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে যে কোনো নদীর ধারে এমনি নুড়ি অনেক পাওয়া যায়।

জামাতুল্লা বল্লে—তোবা! তোবা! এসব কি চিজ্ বাবুজি?

কতকগুলো কৌটার মধ্যে শনের মত শাদা জিনিসের গুলি মত। মনে হয় বহুকাল আগে শনের নুড়ি গুলোতে কোনো গন্ধদ্রব্য মাখানো ছিল—এখনও তার খুব মৃদু সুগন্ধ শনের নুড়ি গুলোর গায়ে মাখানো।

সনৎ বল্লে—দাদা, এটা তাদের ওষুধ বিষুদ রাখার ভাঁড়ার ছিল না তো?

জামাতুল্লা বল্লে—কি দাওয়াই আছে এর মধ্যে বাবুজি?

—তা তুমি আমি কি জানি? প্রাচীন যুগের লোকের কত অদ্ভুত ধারণা ছিল। হয় তো তাদের বিশ্বাস ছিল এই সবই অমর হওয়ার ওষুধ।

হঠাৎ সুশীল একটা জালার মুখ খুলে বলে উঠলো—দেখি, বোধ হয় টাকা—জালা উপুড় করলে তার মধ্যে থেকে পড়লো একরাশ বড় বড় চাকতি, বড় বড় মেডেলের আকারের প্রায় সিকি ইঞ্চি পুরু।

সুশীল একখানা চাকতি হাতে করে বল্লে—সোনা বলে মনে হয় না?

জামাতুল্লা বল্লে—আলবৎ সোনা—তবে টাকা বা মোহর নয়।

সুশীল বল্লে—কোনো রকম ছাপ নেই। মুদ্রা করবার জন্যে এগুলো তৈরি করা হয়েছিল—কিন্তু তারপর ছাপ এতে মারা হয় নি—এ অনেক আছে—

সনৎ বল্লে—সব রকম কিছু কিছু নাও দাদা—

জামাতুল্লা বল্লে—এ যদি সোনা হয়, এই এক জালার মধ্যেই লাখ টাকার সোনা—

সুশীল আর একটা জালা পেড়ে ঢাকুনি খুলে উপুড় করে ঢাললে। তার মধ্যেও অবিকল অমনি ধাতর চাকতি একই আকারের, একই মাপের।

জামাতুল্লা বল্লে—শোভানাল্লা! দুলাখ হোল—যদি আমরা দেখি সব জালাতেই এ-রকম—

এই সময় সুশীল প্রায় চীৎকার করে বলে উঠলো—শীগগির এদিকে এসো—

ওরা গিয়ে দেখলে অন্ধকার ঘরের কোণে কতকগুলো মানুষের হাড়গোড়—ভাল করে টর্চ্চ ফেলে দেখা গেল দুটো নরকঙ্কাল!

সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার পাতালপুরীর মধ্যে নরকঙ্কাল দুটো যেন ওদের সমস্ত আশা ও চেষ্টাকে দাঁত বার করে উপহাস করচে। কাল রাত্রের স্বপ্নের কথা ওর মনে এল, মৃত্যুর চেয়ে মহা রহস্য জগতে কি আছে? মূঢ় লোকে চারি পাশে মৃত্যু অহরহ দেখচে, অথচ ভাবে না কি গভীর রহস্যপুরীর দ্বারপাল স্বরূপ ইহলোক ও পরলোকের পথে মৃত্যু আছে দাঁড়িয়ে।······

নরকঙ্কাল দুটী কি কথা না জানি বলতো যদি এরা এদের মরণের ইতিহাস ব্যক্ত করতে পারতো? সে লোভ হয়তো দুর্ণিবার লোভ ও নৃশংস অর্থ লিপ্সার ইতিহাস, হয়তো তা

রক্তপাতের ইতিহাস, জীবন মরণ নিয়ে খেলার ইতিহাস, ভাই হয়ে ভাইয়ের বুকে ছুরি বসানোর ইতিহাস……

জামাতুল্লা কঙ্কালগুলো সরিয়ে রাখতে গিয়ে বল্লে—হাড় ভেঙে যাচ্ছে বাবুজি, বহুৎ পুরোণো আমলের হাড়গোড় এ সব। কম্‌সে কম একশো দেড়শো বছরের পুরোণো—কিন্তু দেখুন বাবুজি মজা, হাড়ের গায়ে এসব কি ?

ওরা হাতে করে নিয়ে দেখলে।

প্রায় এক ইঞ্চি করে লবণের স্তর শক্ত হয়ে জমাট বেঁধে আছে কঙ্কালের ওপরে! সুশীল ভাল করে টর্চ্চের আলো ফেলে বল্লে—চোখের কোটরগুলো নুনে বুজোনো—ত্যাখো চেয়ে!

এর যে কি কারণ ওরা কিছুই ঠিক করতে পারলে না। অন্ধকার পাতালপুরীর সহরে ওদের হাড়ে নুন মাখাতে এসেছিল কে ?

সেই সময়ে সনৎ বল্লে—ত্যাখো দাদা, ত্যাখো জামাতুল্লা সাহেব—এটা কিসের দাগ ?

ওরা পেছন ফিরে চেয়ে দেখলে সনৎ টর্চ্চ ফেলে দেওয়ালের গায়ের একটা শাদা রেখার দিকে চেয়ে কথা বলছে। রেখাটা লম্বা টানা অবস্থায় দেওয়ালের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত টানা।

জামাতুল্লা বল্লে—এ দাগ নোনা জলের দাগ—খুব টাট্‌কা দাগ।

সুশীল ও সনৎ হতভম্ব হয়ে বল্লে—তার মানে ? জল আসবে কোথা থেকে ?

জামাতুল্লা বল্লে—বড্ড অন্ধকার জায়গা, ভাল করে কিছুই তো মালুম পাওয়া যাচ্ছে না—কিন্তু একবার ভাল করে ঘরের চারিধারে দেখা দরকার। অজানা জায়গায় সাবধান থাকাই ভালো ! এত স্যাঁৎসেঁতে কেন ঘরটা, আমি অনেকক্ষণ থেকে তাই ভাবচি।

জামাতুল্লা ও সনৎ হাতড়ে সোনার চাক্‌তি বের করে থলের মধ্যে একরাশ পুরে ফেললে—পাথরের নুড়িও কিছু নিলে—বলা যায় না যদি এগুলো কোনো দামী পাথর হয়ে পড়ে ! বলা যায় কি ! সনৎ ছেলেমানুষ, সে এত সোনার চাক্‌তি দেখে কেমন দিশাহারা হয়ে গেল—উন্মত্তের মত আঁজলা ভরে চাক্‌তি সংগ্রহ করে তামার জালার মধ্যে থেকে, আর থলের ভেতর পুরে নেয়। যেন এ আরব্য উপন্যাসের একটা গল্প—কিংবা রূপকথার মায়াপুরী—পাতালপুরীর ধনভাণ্ডার। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় বেলা দশটা থেকে বিকেল ছ'টা এস্তেক কলম পিষে সাঁইত্রিশ টাকা ন' আনা রোজগার করতে হয় সারামাসে। সেই হোল রূঢ় বাস্তব পৃথিবী—মানুষকে ঘা দিয়ে শক্ত করে দেয়। আর এখানে কি, না—হাতের আঁজলা ভরে যত ইচ্ছে সোনা নিয়ে যাও, হীরে নিয়ে যাও—এ আলাদা জগৎ, পৃথিবীর অর্থনৈতিক আইন-কানুনের বাইরে।

বহু প্রাচীনকালের মৃত সভ্যতা এখানে প্রাচীনদিনের সমস্ত

বর্ব্বর প্রাচুর্য্য ও আদীম অর্থনীতি নিয়ে সমাধিগর্ভে বিস্মৃতির ঘুমে অচেতন—এ দিন বাতিল হয়ে গিয়েচে, এ সমাজ বাতিল হয়ে গিয়েচে—একে অন্ধকার গহ্বর থেকে টেনে দিনের আলোয় তুলে—বিংশ শতাব্দীর জগতে আর অর্থনৈতিক বিভ্রাট ঘটিও না।

হঠাৎ কিসের শব্দে সুশীলের চিন্তার জাল ছিন্ন হোল—বিরাট, উন্মত্ত, প্রচণ্ড শব্দ—যেন সমগ্র নায়েগ্রা জলপ্রপাত ভেঙে ছুটে আসচে কোথা থেকে—কিংবা শিবের জটা থেকে যেন গঙ্গা ভীম ভৈরব বেগে ইন্দ্রের ঐরাবৎকে ভাসিয়ে মর্ত্তে অবতরণ করচেন!

জামাতুল্লার চীৎকার শোনা গেল সেই প্রলয়ের শব্দের মধ্যে—জল! জল! পালান—ওপরে উঠুন—

জামাতুল্লার কথা শেষ হতে না হতে সুশীলের হাঁটু ছাপিয়ে কোমর পর্য্যন্ত জল উঠলো—কোমর থেকে বুক লক্ষ্য করে দ্রুতগতিতে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে জামাতুল্লা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লে—ঐ দেখুন বাবু!

সুশীল সবিস্ময়ে ও সভয়ে চেয়ে দেখলে ঘরের ছাদের কাছাকাছি সেই দুটো পয়োনালা দিয়ে ভীষণ তোড়ে জল এসে পড়চে ঘরের মধ্যে। চক্ষের নিমেষে ওরা ইঁদুর কলে আট্কা পড়ে জলে ডুবে দম বন্ধ হয়ে মরলো!···কিন্তু উঠবে কোথায়! উঠবে কিসের সাহায্যে? এ ঘরে সিঁড়ি নেই আগেই দেখে এসেচে।

সুশীল চীৎকার করে বল্লে—সনৎ—সনৎ—ওপরে ওঠ্‌—শীগ্‌গির—

সনৎ বল্লে—দাদা, তুমি আমার হাত ধরো—হাত ধরো—

তারপরে হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল—পুরাণো রাজাদের পোষমানা বেতাল যেন কোথায় হা হা করে বিকট অট্টহাস্য করে উঠলো—সম্মুখে মৃত্যু! উদ্ধার নেই! উদ্ধার নেই!

এ জলে সাঁতার দেওয়া যাবে না সুশীল জানে—এ মরণের ইঁদুর কল। বুক ছাপিয়ে জল তখন উঠে প্রায় নাকে ঠেকে ঠেকে—

কে যেন অন্ধকারের মধ্যে চেঁচিয়ে উঠলো—দাদা—দাদা আমার হাত ধরো—দাদা—

এক জোড়া শক্ত বলিষ্ঠ হাত ওকে টেনে ওপরের দিকে তুল্লে টেনে। ঘন অন্ধকার। টর্চ্চ কোথায় গিয়েচে সেই উন্মত্ত জলরাশির মধ্যে। সুশীলের প্রায় জ্ঞান নেই। সে ডাকছে—কে? সনৎ?

কোনো উত্তর নেই। কেউ কাছেও নেই।

সুশীলের ভয় হোলো। সে চেঁচিয়ে ডাকলে—সনৎ! জামাতুল্লা।

তার পায়ের তলায় উন্মত্ত গর্জ্জনে যেন একটা পাহাড়ের মাথায় হ্রদ খসে পড়েছে। উত্তর দেয় না কেউ—না সনৎ, না জামাতুল্লা!

প্রায় দশমিনিট পরে জামাতুল্লা বল্লে—বাবুজি, জল্‌দি আমার হাত পাকড়ান—

—কেন ?

—পাকড়ান হাত—উপরে উঠবো—সাবধান !

—সনৎ, সনৎ কোথায় ? তাকে রেখে এলে উপরে !

—জল্‌দি হাত পাকড়ান—হুঁ—

কত যুগ ধরে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে সে ওঠা প্রলয়ের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে—তারপর কতক্ষণ পরে পৃথিবীর ওপরে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা পাতালপুরীর গহ্বর থেকে। বনের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার যেন ঘনিয়ে এসেচে। সুশীল ব্যগ্রভাবে বল্লে—সনৎ কই ? তাকে কোথায়—

জামাতুল্লা—বিষাদ মাখানো গম্ভীর সুরে বল্লে—সনৎবাবু নেই—আমাদের ভাগ্য বাবুজি—সুশীল বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে বল্লে—নেই মানে ?

—সনৎ বাবু তো পাতালপুরী থেকে ওঠেন নি—তাঁকে খুঁজে পাইনি। আপনাকে তুলে ওপরে রেখে তাঁকে খুঁজতে যাবো এমন সময় ঘরের মেজে দুলে উঠে এঁটে গেল। তিনি থেকে গেলেন তলায়—আমরা রয়ে গেলাম ওপরে। তাঁকে খুঁজে পাই কোথায় ?

—সে কি ! তবে চলো গিয়ে খুঁজে আনি !...

জামাতুল্লা বিষাদের হাসি হেসে বল্লে—বাবুজির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েচে, এখন কিছু বুঝবেন না। একটু ঠাণ্ডা হোন,

সব বলচি। সনৎ বাবুকে যদি পাওয়া যেতো তবে আমি তাকে ছেড়ে আসতাম না।

—কেন? সনৎ কোথায়? হ্যাঁরে, আমি ওকে ছেড়ে বাড়ী গিয়ে মার কাছে, খুড়ীমার কাছে কি জবাব দেবো? কেন তুমি তাকে পাতালে ফেলে এলে?

জামাতুল্লা নিজের কপালে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে বল্লে—নসীব, বাবুজি—

উদ্‌ভ্রান্ত সুশীলের বিহ্বল মস্তিষ্কে ব্যাপারটা তখনও ঢোকেনি। জলের মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে দম বন্ধ হয়ে সনৎ ওপরে উঠবার চেষ্টা করেও উঠতে পারেনি। অন্ধকারের মধ্যে জামাতুল্লাও ওকে খুঁজে পায়নি। ওরই হাত ধরে টেনে তুলবার পরে ঘরের মেজে এঁটে গিয়ে রত্ন ভাণ্ডারের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ওই ঘরের ছাদ পর্য্যন্ত জল ভর্ত্তি হয়ে গিয়েচে এতক্ষণ—সেখানে মানুষ কতক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে?···

সুশীল ক্রমে সব বুঝলে ওপরে উঠে এসে মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগানোর পরে। একটা গভীর শোক ও হতাশায় সে একেবারে ডুবে যেতো হয়তো কিন্তু ঘটনাবলীর অদ্ভুতত্বে সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লো। কোথায় অন্ধকার পাতালপুরীতে পুরাকালের ধনভাণ্ডার, যে ধনভাণ্ডার, অসাধারণ উপায়ে সুরক্ষিত—এমন কৌশলে যা এ কালে হঠাৎ কেউ মাথায় আনতেই পারতো না।

জামাতুল্লা বল্লে—পানি দেখে তখনই আমার সন্দেহ হয়েচে। আমি ভাবচি, এত নোনা পানি কেন ঘরের মধ্যে ?

সুশীল—আমাদের তখনই বোঝা উচিত ছিল জামাতুল্লা। তা হোলে সনৎ আজ এভাবে—

তখন কি করে জানবো বাবুজি ? ঐ নালি দুটো গাঁথা আছে—ও দিয়ে জোয়ারের সময় সমুদ্দুরের নোনাপানি ঢোকে—দিনে একবার, রাতে একবার। আমার কি মনে হয় জানেন বাবুজি, ওই দুটো নালি এমন ফন্দি করে গাঁথা হয়েছিল যে—

সুশীল বল্লে—আমার আর একটা কথা মনে হয়েচে জানো ? ওই দুটো নরকঙ্কাল যা দেখলে, আমাদেরই মত দুটো লোক কোন কালে ওই ঘরে ধনরত্ন চুরি করতে গিয়ে সমুদ্রের নোনা জলে হাবুডুবু খেয়ে ডুবে মরেচে। মুর্খের মত ঢুকেচে, জানতো না। যেমন আমরা—সনৎ যেমন—

কি জানতো না ?

যে—স্বয়ং ভারত মহাসমুদ্র প্রাচীন চম্পারাজ্যের রত্নভাণ্ডারের অদৃশ্য প্রহরী।

কেউ কোনোদিন সে ভাণ্ডার থেকে কিছু নিতে পারবে না, মানমন্দিরের রত্নশৈল তার একখানি সামান্য নুড়িও হারাবে না।

সুশীল বল্লে—কিন্তু জল যায় কোথায় জামাতুল্লা ? এত জল ! আমার কি মনে হয় জানো—

—আমারও তা মনে হয়েচে। ওই ঘরের নীচে আর একটা

ঘর আছে, সেটা আসল ধনভাণ্ডার। বেশী জল বাধলে ঘরের মেজে একদিকে ঢাল হয়ে পড়ে জলের চাপে—সব জল ওপরের ঘর থেকে নীচের ঘরে চলে যায়।

সুশীল বল্লে—ষ্টীম পাম্প আনলেও তার জল শুকানো যাবে না, কারণ—তাহলে গোটা ভারত মহাসাগরকেই ষ্টীম পাম্প দিয়ে তুলে ফেলতে হয়—ওর পেছনে রয়েচে গোটা ভারত মহাসমুদ্র। সে জামাতুল্লার দিকে চেয়ে বিষাদের সুরে বল্লে—এই হোল তোমার আসল বিষ্কমুনি সমুদ্র, বুঝলে জামাতুল্লা ?

ওরা সেই বনের গভীরতম প্রদেশে একটা পুরোনো মন্দির দেখলে। মন্দিরের মধ্যে এক বিরাট দেবমূর্ত্তি, সুশীলের মনে হোল সম্ভবতঃ বিষ্ণুমূর্ত্তি।

যুগযুগান্ত কেটে গেছে, মাথার ওপরকার আকাশে শত অরণ্যময়ূরীদের নর্ত্তন শেষ হয়ে হয়ে আবার সুরু হয়েচে, রক্তাশোকতরুর তলে কত সুখসুসুপ্ত হংসমিথুনের নিদ্রাভঙ্গ হয়েচে—সাম্রাজ্যের গৌরবের দিনে ঘৃতপক্ব অমৃতচরুর চারুগন্ধে মন্দিরের অভ্যন্তর কতদিন হয়েছে আমোদিত—কত উত্থান, কত পতনের মধ্যে দেবতা অবিরল দৃষ্টিতে বহুদূর অনন্তের দিকে চেয়ে আছেন, মুখে সুকুমার সব্যঙ্গ মৃদু চাপা হাসি—নিরুপাধি চেতনা যেন পাষাণে লীন, আত্মস্থ।

সুশীল সসম্ভ্রমে প্রণাম করল—দেবতা, সনৎ ছেলেমানুষ—ওকে তোমার পায়ে রেখে গেলুম—ক্ষমা করো তুমি ওকে।

* * * *

সুশীল কলকাতায় ফিরেচে।

কারণ যা ঘটে গেল, তার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। ইয়ার হোসেন সন্দেহ করে নি। সনৎ একটা সুযোগে কূপের মধ্যে পড়ে মরে গিয়েছে শুনে ইয়ার হোসেন খুঁজে দেখবার আগ্রহও প্রকাশ করেনি। চীনা মাঝি জাঙ্ক নিয়ে এসেছিল—তারই জাঙ্কে সবাই ফিরলে সিঙ্গাপুরে। সিঙ্গাপুর থেকে অষ্ট্রেলিয়ান্ মেল্‌বোট ধরে কলম্বো।

কলম্বোর এক জহুরীর দোকানে জামাতুল্লা সেই হর্ত্তুকির মত জিনিস দেখাতেই বল্লে—এ খুব দামী জিনিস, ফসিল্ এ্যাম্বার—বহুকালের এ্যাম্বার কোনো জায়গায় চাপা পড়েছিল। দুখানা পাথর দেখে বল্লে—আনকাট্ এমারেল্ড, খুব ভাল ওয়াটারের জিনিস হবে কাট্‌লে। আন্নামালাইয়ের জহুরীরা এমারেল্ড কাটে, সেখানে গিয়ে কাটিয়ে নেবেন। দামে বিকোবে।

সবশুদ্ধ পাওয়া গেল প্রায় সত্তর হাজার টাকা। ইয়ার হোসেনকে ফাঁকি না দিয়ে ওরা তাকে তার ন্যায্য প্রাপ্য দশ হাজার টাকা পাঠালে—সেই মাদ্রাজী বিধবাকে পাঠালে বিশহাজার—বাকী টাকা তিন ভাগ হোল জামাতুল্লা, সনতের মা ও সুশীলের মধ্যে।

টাকার দিক থেকে এমন কিছু নয়, অভিজ্ঞতার দিক থেকে অনেকখানি। কত রাত্রে গ্রামের বাড়ীতে নিশ্চিন্ত আরাম শয়নে শুয়ে ওর মনে জাগে মহাসমুদ্র পারের সেই প্রাচীন

হিন্দুরাজ্যের অরণ্যাবৃত ধ্বংসস্তূপ, সেই প্রশান্ত ও রহস্যময় বিষ্ণুমূর্ত্তি···হতভাগ্য সনতের শোচনীয় পরিণাম, অরণ্য মধ্যবর্ত্তী তাঁবুতে সে রাত্রির সেই অদ্ভুত স্বপ্ন। জীবনের গভীর রহস্যের কথা ভেবে তখন সে অবাক হয়ে যায়। জামাতুল্লা নিজের ভাগের টাকা নিয়ে কোথায় চলে গেল, তার সঙ্গে আর সুশীলের দেখা হয় নি।

সমাপ্ত